ভয়েস মার্ক

এসপিসিও-র দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা
মার্চ -এপ্রিল ২০২২

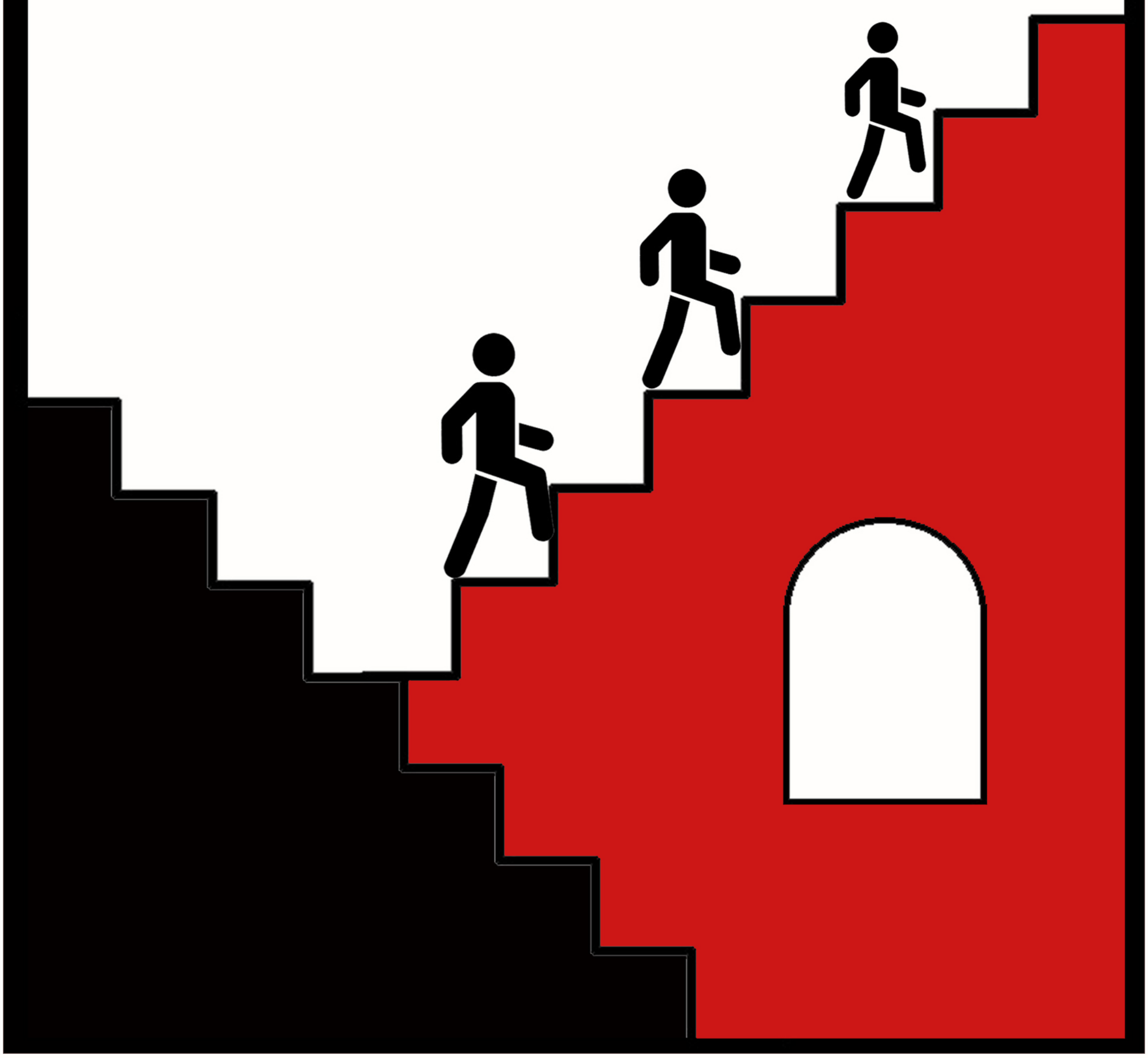

ভয়েস মার্ক

এসপিসিও ট্রাস্টের দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকা (বিশেষ সংখ্যা বাদে)
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১৫০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান

বহরমপুর : ৯৭৩৫৮৭৪৩৮৪ / ৯৯৩২৬০৭৭১৪
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ
ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
এসপিসিও অফিস
ডিহিপাড়া, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
E-mail: voicemark19@gmail.com
spcomsd21@gmai.com
Mob: 9735874384 / 9932607714
Web: www.voicemark.in

ভয়েস মার্ক

চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল ২০২২
Vol. 4 Issue: 2 Voice Mark

সম্পাদকঃ মোঃ আযাদ হোসেন

যোগাযোগঃ
Email: spcomsd21@gmail.com
voicemark19@gmail.com
WhatsApp : 9932837185
Mob. 9735874384

গ্রাহক পরিষেবাঃ রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

প্রচ্ছদঃ হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মুদ্রণ ও অলংকরণঃ মোঃ মিনারুল হক

ওয়েব সাইটঃ www.voicemark.in

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা

পত্রিকার প্রাপ্তি স্থানঃ অফিস ছাড়াও বহরমপুর স্টেশন বুকস্টল ও সরস্বতী বুকস্টল, বহরমপুর; পাতিরাম বুকস্টল, কলকাতা; প্রাপ্তি বুকস্টল, সিমলাপাল, বাঁকুড়া; কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগনা।

সম্পাদকীয়
দুর্নীতি ৩

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ
গণতন্ত্রের বুলডোজার
সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি ১০
সুতপা চৌধুরি হত্যাকাণ্ড ১২
রাজ্যের বেসামাল আইন-শৃঙ্খলা
শ্রীলংকার সংকট
শিক্ষায় কর্পোরেট পুঁজিঃ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

প্রবন্ধ
আর্থসামাজিক অন্ধকার মোচনের শিক্ষা ও দীক্ষা
শ্রীচেতনিক
রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের ১০০ দিন
কিংশুক সন্ন্যাসী

গল্প
ট্যাঁড়া
বরুণ শ্যেন
লড়াই
কস্তুরী
দাসত্ব
আব্দুল মোমিন
তিতাস
সুকৃতি
হিত-অহিত
রনিক পারভেজ
কুয়াশা সরিয়ে
বৈশালী রায় চৌধুরী
স্বেচ্ছাসেবক
সুদীপ সরকার
বেঁচে থাকার স্বপ্ন
তুষার ভট্টাচার্য

কবিতা
মানিক জ্যোতি দাস এর দুটি কবিতা

রঞ্জন পাড়ুই এর গুচ্ছ কবিতা

সোসিও প্ল্যান কালচার অরগানাইজেশন (এসপিসিও) ট্রাস্টের পক্ষে মোঃ আযাদ হোসেন কর্তৃক ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী 'অস্তিত্ব'	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী 'অস্তিত্ব'	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

'অস্তিত্ব' প্রকাশেয় গ্রন্থাবলি

১। পূর্বপ্রসঙ্গ	১৬টি কলম
২। সৃষ্টিতত্ত্ব	২২টি কলম
৩। জীবনতত্ত্ব	৪৮টি কলম
৪। দেহতত্ত্ব	৮টি কলম
৫। জীবতত্ত্ব	১টি কলম
৬। ঋজুতত্ত্ব	৭৪০টি কলম
৭। সরেজমিন বা স্পটলাইট	একটি সিরিজ
৮। একসোডাস কল্লোল (কবিতা)	একটি সিরিজ
৯। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্ত পূর্ব এবং ...	একটি সিরিজ

প্রকাশক

গাইডেন্স ফাউন্ডেশন

ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫

১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

পরিবেশক

সোসিও প্ল্যান কালচার অরগানাইজেশন (এসপিসিও)

ভগবানপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৮

ফোন- ৯৯৩২৬০৭৭১৪

ই-মেলঃ spcomsd21@gmail.com

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি

রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও নন টিচিং স্টাফ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির তদন্তভার সিবিআইকে ন্যস্ত করেছেন।

শাসকদলের মন্ত্রীরা সিবিআইয়ের জেরার কবলে পড়েছে। বিরোধী দলগুলি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলতে চায় বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেই প্রচারে হাওয়া দিচ্ছে। শাসকদল আত্মপক্ষ সমর্থনে চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা কলকাতার রাস্তায় ছাউনি বেঁধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা কবে চাকরি পাবেন বা পাবেন না তার থেকে বড় বিষয় শাসক দল, বিরোধী দল, কোর্ট, পুলিশ প্রশাসন ইত্যাদি মিলিয়ে এক জবরদস্ত যাত্রাপালা! এ প্রসঙ্গেই বুঝে নেয়া যাক নীতি ও দুর্নীতির বিষয়টিকে।

দুর্নীতি অর্থে দুর যে নীতি অর্থাৎ নিন্দিত যে নীতি অর্থাৎ দুষ্ট নীতি। তাহলে নীতি কী?

নীতি হলো তা-ই যা জীবনকে প্রয়োজনের বাঁধনে বাঁধে। যাতে দখল আর প্রয়োজনকে ব্যালান্স করা যায়। এই দখলকে প্রয়োজনের নিরিখে বেঁধে রাখার নিয়মটি হল নীতি। এই নীতি মানুষ কখন কোথায় কীভাবে পেল? না, ভাবনা-চিন্তা-অবজারভেশন থেকেই সে দখলের ভয়াবহতা কে প্রতিহত করার জন্য এই বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ এথিকস বা নীতিবিজ্ঞান হঠাৎ করে কারো মাথায় গজিয়ে যাওয়া কোন কষ্টকল্পনা নয় বা কোনো তথাকথিত উপরওয়ালার থেকে ডাউনলোড হয়ে যাওয়া কোন কিছু নয়। তা মানবজাতির জীবন জিজ্ঞাসার বিবর্তনে অর্জিত হয়েছে।

এই নীতি বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকারের স্বীকৃতির নিয়মের বাইরে যা কিছু তা-ই দুর্নীতি। যা আসলে অনধিকার দখলদারির বেলাগাম আচরণ। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এর একটি পর্যায়ে সামন্ত অর্থনীতি যখন পুঁজি অর্থনীতি নামের আড়ালে শ্রম সম্পর্কটিকে পুনরায় গুলিয়ে দিল সেই সময়ে সমকালীন রক্ষণকামী ক্ষমতা বুঝে নিল যে নীতি বিজ্ঞানের কিছু কিছু জিনিস কে রাস্ট্র রাষ্ট্র পরিচালনায় অঙ্গীভূত না করলে শ্রম সম্পর্ক বলভিত্তিক পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এই ভয় থেকে সে অনধিকার দখলদারিকে একটা ভদ্রস্ত কায়দায় নিয়ে যাবার জন্য বচন কৈবল্যরূপে নীতিবিজ্ঞানের ভাষ্যগুলিকে তার কথিত সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করল। কিন্তু শ্রম ও মূল্য উৎপাদন এবং মূল্য বিভাজনের গোটা প্রক্রিয়াটাই সেই নিয়ম নীতি বহির্ভূতভাবে অর্থাৎ দুষ্ট নীতিতেই অর্থাৎ বেলাগাম অনধিকার দখলদারিকে সব ধরনের ছাড় দিয়ে সংঘটিত হতে থাকলো। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে শ্রমিকের শ্রমের উৎপাদিত মূল্য, কৃষকের উৎপাদিত ফসল সহ যাবতীয় ক্ষেত্রে মানুষের সম্মিলিত উৎপাদিত আর্থসামাজিক সম্পদ বৃহৎ পুঁজি গোষ্ঠীগুলির কব্জায় নানান কায়দায় কুক্ষি করে দেবার ব্যবস্থা হতে থাকলো। অর্থাৎ গোটাটাই দুর্নীতি!

বর্তমানে দুর্নীতি স্লোগানের মাধ্যমে বহু রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে হাতবদল হয়েছে। হাত বদলের পর নতুন শাসক গোষ্ঠী পুনরায় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। আরেকটি প্রবণতা দেখা গেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে যে সমস্ত শাসকরা ক্ষমতায় এসেছেন হয় তারা ততোধিক দুর্নীতির সংক্রমণ ঘটিয়েছেন অথবা অটোক্রেটিক ক্ষমতা-মদমত্তা সংক্রমণ ঘটিয়েছেন।

যেমন ২০১৪ সালে ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০১৪-২০২২ এই আট বছরে কর্পোরেট বিজনেস হাউস যে পরিমাণ মুনাফা লুন্ঠন করতে সমর্থ হয়েছে তা বিগত কয়েক দশক ধরে পারেনি। অতঃপর সুপবন বহিতেছে!

এ রাজ্যে সেই কর্পোরেট গোষ্ঠীরই অপর সহযোগী ক্ষমতা দখলের পর একই কাণ্ড করে চলেছে বিগত ১০ বছর ধরে।

আর্থসামাজিক সম্পদকে ব্যক্তি কুক্ষির আওতায় এই যে লুট করে নেওয়া এর থেকে বড় দুর্নীতি তো আর কিছু নেই। এই দুর্নীতিকে আড়াল করতে তাদেরই প্রতিনিধি যারা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত আছে, সরকারি প্রকল্পে সরকারি আধাসরকারি চুক্তিভিত্তিক প্রভৃতি নিয়োগ ক্ষেত্রে যৎসামান্য নিয়োগ দেয়ার বিনিময়ে সামাজিক নৈতিকতাকে লঙ্ঘণ করে যে কাণ্ড কারখানা চালায় তাকেই সেই নেপথ্য ক্ষমতা দুর্নীতি বলে নামাঙ্কন করে। আর এর পেছনে লেলিয়ে দেয় মিডিয়া এবং বিক্ষুব্ধ গণমানসকে।

ব্যাপারটা কী দাড়াল?

সেই পুরনো কাহিনি। উদে মাছ মারে আর খাটাসে তিনভাগ করে। উদোবিড়াল রূপী শ্রমজীবী মানুষের শ্রম-ঘামে উদপাদিত সম্পদ ব্যক্তি কুক্ষি হয়ে গেলে আর্থসমাজ রক্ত শূন্যতায় ভোগে।

পরবর্তী অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

গণতন্ত্রের বুলডোজার

ঘটনা /১

দিল্লির জহাঙ্গিরপুরী এলাকায় পুরসভা (North Delhi Municipal Corporation) অবৈধ বসতি উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে শ'খানেক পরিবারকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাস্তুচ্যুত করল। সুপ্রিমকোর্টের স্থগিতাদেশও পুর-কর্তৃপক্ষকে নিবৃত্ত করতে পারল না। কোর্টের নির্দেশ সংবলিত কাগজপত্র নিয়ে সিপিএম এর বর্ষীয়ান নেত্রী বৃন্দা কারাত বুলডোজারের সামনে দাঁড়ালে ধ্বংসলীলা বন্ধ হল।

সরকারি-দরবারি সংবাদ মাধ্যম কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ দৌড়িয়ে কেউবা বুলডোজারের সিটে বসে সেই ধ্বংস কাণ্ডের লাইভ প্রচার করল।

পুর কর্তৃপক্ষ জানালেন, কোর্টের নির্দেশের কপি তাঁদের হাতে পৌঁছয়নি! ভাবখানা এমন যেন, বিচার বিভাগের লিখিত নির্দেশ বিনা এই দেশে গাছের পাতাটিও নড়ে না।

বৈধ, অবৈধ /২

বৈধ কী, আর বৈধ ও অবৈধের সীমারেখাটাই বা কে আঁকবে? এই কাণ্ডটি কি আইন-বিধিগতভাবে বৈধ? সেই প্রসঙ্গেই এই প্রশ্ন এসে যায়।

আজকের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে এ প্রশ্ন সঙ্গত। দিল্লির অভিজাত এলাকার বাড়িগুলির অধিকাংশই অবৈধ জমিতে নির্মিত। তা প্রায় সব রাজনৈতিক দলই জানে। সেগুলি কেন ভাঙা হয় না? কেবল কেন জবরদখলের দায়ভার দিয়ে বুলডোজ করা হয় গরিব মহল্লার অতি সাধারণ পরিবারগুলিকে? সেই মহল্লার মানুষদের অপরাধ, তারা ধর্মপরিচয়ে অপর। তদুপরি তারা বাংলায় কথা বলেন। তবে তো নিশ্চয়ই তারা বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা হলেও হতে পারে! অতএব এরা 'অবৈধ' অনুপ্রবেশকারী।

উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার ধরন নিয়ে মতভেদ থাকলেও, 'অনুপ্রবেশ' ও 'বাংলাদেশি'-র প্রশ্নে দিল্লির আপ সরকার ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের গলায় প্রায় একই সুর! এমনকি এক প্রবীণ বাম নেতাও বেমালুম বলে বসলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভাবতে হবে কারা দিল্লিতে গিয়ে এসব করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবার মতো সত্যিই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আছে। কিন্তু বাংলাভাষী মাইনোরিটি বর্ণ-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার চাঁদমারি বলেই সকলকে ভাবতে বসতে হবে? সেই ভাবনা যতই অবৈধ হোক না কেন? খোলা চোখেই এটি দৃশ্যমান যে গোটা ঘটনাটিই অবৈধ। দেশের আইনেই সেটি একটি গর্হিত ও অবৈধ কাণ্ড। রাষ্ট্রের ভিত্তি যে সংবিধান নির্ভর হবার কথা সেই সংবিধানগত আইনকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বুলডোজার কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

বহুমাত্রিক জীবনের বিধান /৩

গত আট বছরে সংবিধানের মৌলিক নিয়মগুলিকে একের পর এক ভায়োলেট করে চলেছে রাষ্ট্র। মত ও পথের ভিন্নতাই দেশের সাংবিধানিক নৈতিকতার মানদণ্ডে বৈধ। এর বাইরে যে কোনও আরোপিত ও একরৈখিক পথই অবৈধ।

রাষ্ট্রীয় প্রযোজনায় মেজরিটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা মাইনোরিটি বসতির মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে মাইনোরিটি দেবালয়ের পথে যেতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি সংক্রামিত করে। মেজরিটি সেন্টিমেন্ট উসকানো যায় না মাইনোরিটিকে আক্রমণ না করলে।

দেশের সংবিধান প্রণেতারা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে মাইনোরিটিকে প্রটেকশন দিয়েছেন। ভাষা, রিলিজিয়াস রিচুয়াল, খাদ্যাভ্যাস সহ নানান বহুমাত্রিকতার সেফগার্ড হিসেবে সংবিধান দেশের ঐক্য ও সংহতি প্রটেক্ট করে এসেছে। স্বাধীনোত্তর দেশে ঔপনিবেশিক চণ্ডামি ইন্ডিয়ান পিনাল কোডে বেশ পরিমাণেই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক স্পিরিট সেই সমস্তকে ডিলিট করে দেবার ব্যবস্থাপত্র সংবিধানের মধ্যেই রেখেছে।

গত ৮ বছরে সেই বিধানিক কবচের সারমর্মটি যেন ক্রমশ হাস্যাষ্পদ হতে হতে পরিহাসে পরিণত হয়েছে। বেরিয়ে এসেছে কয়েকটি শব্দ। এক দেশ, এক নির্বাচন। এক দেশ, এক ট্যাক্স। এক দেশ, এক মার্কেট। এই সব জনমন রঞ্জনী কিছু স্লোগান। যা অতি জাতীয়তার ছদ্মাবরণে জীবনের, সমাজের, দেশের বহুমাত্রিকতার যাবতীয় কাণ্ডজ্ঞানকে ক্রমশ পিছনের সারিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে এমতাবস্থায় বৈধ-অবৈধের স্বাভাবিক আইনি মাপকাঠি গেছে গুলিয়ে। সংখ্যাগুরুর অভিলাষ হচ্ছে যাবতীয় অবৈধতাকে সংখ্যার জোরে, শব্দের জোরে বৈধতা দান করা। আজান বিতর্ক, জাহাঙ্গিরপুরীর ঘটনা তো এই সব কিছুরই প্রতিফলন। অবৈধ বসতির উচ্ছেদের আগেও অন্তত বিধি মোতাবেক একটা নোটিশ জারি করা হয়, আর আজকের ভারতে উচ্ছেদের পূর্ব লক্ষণ হল, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মিছিল যাওয়া। জাহাঙ্গিরপুরীর বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলি দীর্ঘ চার-পাঁচ দশক এই এলাকায়

বাস করে 'জবরদখলকারী'র তকমা পেলেন। আর জনগণের রায়ে প্রত্যাখ্যাত জনপ্রতিনিধিরা বাংলো বাড়ি দখল করে পড়ে থাকার পরেও বহাল তবিয়তে রয়ে গেলেন

শক্ত শাসক: দেশ ও বিশ্ব /৪

জনগণের 'বৈধ' ভোটে নির্বাচিত শাসক শুধু জহাঙ্গিরপুরীতে নয়, অবৈধ বসতি ভাঙছে মধ্যপ্রদেশ কিংবা উত্তরপ্রদেশেও। সংখ্যাগুরুর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে না, আবার সংখ্যালঘুর অবৈধতাও প্রশ্নহীন থেকে যাচ্ছে। যিনি ভাঙতে পারেন, ব্যক্তি পুজোর দেশে তারই জয়জয়কার। তিল তিল করে গড়ে তোলা এই দেশে সশব্দে ভাঙছে বহুমাত্রিক জীবনের বনিয়াদ, ভিন্নমত।

ভাঙনের জয়গান গেয়ে ভক্তরা প্রিয় নেতার নাম দিচ্ছেন 'বুলডোজার মামা' (মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান এই নামেই পরিচিত), কিংবা 'বুলডোজার বাবা' (যোগী আদিত্যনাথ)। শাসকদলের জনৈক নেতা বুলডোজারকে 'জেহাদি' অপসারণের যন্ত্র বলে দাবি করেছেন।

শুধু দেশের কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতিবিশিষ্ট অতিকায় পুরুষ! শক্তিশালী শাসক। মিডিয়ার সাহায্যে তার লারজার দ্যান লাইফ ইমেজ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর শক্ত শাসক হবার দৃষ্টান্ত তিনি যখন খুশি যা কিছু ফর্মান জারি করতে পারেন অতি অবহেলে। যেমন- নোট বাতিল। লকডাউন। শুধু দেশ নয়। বিশ্বেও একই ধারা। রাশিয়া- ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানি-তুরস্ক- দু-তিন বছর আগের আমেরিকা। সব খানেই সেই শক্ত শাসকের হুংকার।

তাদের সকলের হাতিয়ার পপুলার বিলিফ সিস্টেমকে এক্সপ্লয়িট করা। অর্থাৎ মেজরিটি এপিজমেন্ট। তা করবার জন্য দরকার হয় রাষ্ট্রীয় স্পনসর্ড বুলডোজার! সেই বুলডোজার প্রথমে এগোয় মেজরিটির কাউন্টার পার্ট অর্থাৎ মাইনোরিটিকে গুড়িয়ে দিতে। ক্রমশ তা এগোয় বিরুদ্ধ মতের দিকে। পরে জীবনের সমস্ত রকম বহুমাত্রিকতার বিরুদ্ধে। গড়তে চায় একবগ্গা, গোঁয়ার এক গাঁড়ল-তন্ত্র।

সুপ্রাম্যাসিস্ট ক্ষমতা / ৫

বুলডোজার আজকের ভারতে সুপ্রাম্যাসিস্ট ম্যাসকুলিনিটির সিম্বলিক প্রকাশ! এটিকে সেইরূপে দেখবার জন্য দেশব্যাপী উত্তরপ্রদেশ-দিল্লি-মধ্যপ্রদেশ-হরিয়ানা-চন্ডিগড় প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

টারগেট ফার্স্ট অ্যাণ্ড ফোরমোস্ট মাইনোরিটি মুসলমান জনগোষ্ঠী! তাদের কাছে দেশব্যাপী এই বার্তা পাঠানো যে, থাকো আমার হিসেব মত। নইলে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেব।

এই যে তার 'হিসেব মত' থাকতে হবে! সে কে? সে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদী রাষ্ট্র শক্তি! তার এজেণ্ডা একবগ্গা হিটলারীপনা! যে মূর্খামি পাকিস্তান আফগানিস্তান সহ তথাকথিত ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রগুলি করেছে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহুমাত্রিক ভারতীয় জীবনধারার উপাদানগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে একই ফ্রেমে ঢোকানোর হাস্যকর কাণ্ড করতে চাইছে। এটি করবার জন্য তাদের প্রায় ১০০ বছর ধরে চলে আসা মূর্খ-বাহিনী ধর্ম-সেন্টিমেন্ট নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়েছে।

এ কী চায়?/ এ কি আস্তিক, ধার্মিক? /৬

গণবাচক নিম্নচেতনা এদের সেন্টিমেন্টাল হীনমন্য শ্লাঘামন্যতায় বুলডোজারের আস্ফালনকে সাদরে গ্রহণ শুধু করছে না। এজেণ্ডা রূপায়ণে অর্থাৎ অপকাণ্ড সংঘটনে সরাসরি সংগঠিত লুম্পেন-বাহিনী হিসেবে কাজ করছে। এরা কি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাবিত? না, আদৌও নয়। জীবনের বিকাশ বাচক দিশা নির্ণয়ে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত আর্থসামাজিক ব্যুৎপত্তি অনিবার্যভাবে অর্জন করতে হয়। এরা কি এ পথের পথিক? না। এরা শাস্ত্র নিয়ে ভাবিত? না। তবে? এরা তাহলে কী করতে চায়?

এরা দর্শন নিয়ে ভাবিত হলে রামায়ণ ও মহাভারত তত্ত্ব অনুসন্ধান করতো না কি? অত্রাঞ্চলিক জ্ঞান দর্শন অর্থাৎ বৈদিক আর্যদর্শন, বৌদ্ধদর্শন নিয়ে জীবন জিজ্ঞাসা বাচক এদের কোনো গবেষণা থাকতো নাকি? আপেক্ষিক যুগসংসকট মোকাবিলার ইডিওলজি নিয়ে এদের আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, অধ্যয়ন থাকতো নাকি? মার্কসিজম থেকে এরা বিকর্ষিত হতো কি?

'অস্তিত্ব' দর্শনের প্রতিপাদ্যগুলি আইডেনটিফাই করার প্রয়াস নিত নাকি?

এরা বিজ্ঞান নিয়ে ভাবিত হলে বিজ্ঞান বাচক জীবন প্রযুক্তির পদে পদে বিরোধিতা করতো কি? ব্যাপক জনতার সেন্টিমেন্টকে অপকাজে লাগাতে তাদের আরো আরো সংস্কার-কুসংস্কার-অশিক্ষা-কুশিক্ষার পাঁকে ডুবাতে পারতো কি?

এরা সাহিত্য নিয়ে ভাবিত হলে পুরাণ, বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ এর প্রতীক তত্ত্বের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতো নাকি? অপরাপর চিরায়ত জ্ঞান দর্শন এর স্বরূপ উদঘাটন প্রয়াসী হতো নাকি? ইতিহাস সৃষ্টিবাচক জীবনগামী ঐতিহাসিক ইসলামকে আইডেনটিফাই করার চেষ্টা করতো নাকি? জীবন জিজ্ঞাসার বস্তুপন্থা প্রসঙ্গে

রাজনৈতিক অর্থনীতির গণেশ বাচক রূপ, জড়বাচক রূপ আর বিকাশ বাচক রূপ আবিষ্কার প্রয়াসী হতো নাকি?

তা হলে কূপমণ্ডুক মনে আর হাতে বহুজাতিক কর্পোরেশন সহ এদেশীয় কর্পোরেটের অন্ধ আনুগত্য করতো কি? এরা কি তাহলে ধার্মিক? ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকে? এরা কি তাহলে আস্তিক?

এরা যে শাস্ত্রবিদ নয় তা আগেই বলা হয়েছে। এরা যে শাস্ত্রের জ্ঞান তত্ত্বের ধার ধারে না তাও উল্লেখিত হয়েছে। এরা ধার্মিক তো নয়ই! এরা মূর্তিমান অধার্মিক! কেন? ধর্ম হল সেই প্রক্রিয়া যাতে মহাবিশ্ব প্রকৃতির নিয়মানুগ সাযুজ্যে মানবসত্তা তথা আর্থসমাজসত্তা সেই নিয়মের অধীনে নিজেকে ধারণ করে। যার সাথেই 'ধৃ' অর্থাৎ ধর্ম! এই সংজ্ঞার্থের নিরীক্ষণেও এদের অধার্মিকতার কাণ্ড পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। এদের কাজ একটিই নানান সংস্কারের গাড্ডাই গোটা আর্থসমাজকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা!

এর কি কোনো অর্থনীতি-বীক্ষা আছে? /৭

নির্দিষ্ট কিছু নেই। কিছুকাল আগে পর্যন্ত দেশীয় উমি চাঁদ, জগৎ শেঠ ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক ছিল। বিদেশি পুঁজির বিরুদ্ধে ছিল। আজও দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির পৃষ্ঠপোষক শুধু নয়, তাদের স্বার্থে যেকোনো বাজি ধরতে প্রস্তুত। ২০১৪-২০২২ এই ৮ বছরের আর্থিক নীতির গতিমুখ একটিই। তা হল এই কর্পোরেটের স্বার্থে সমস্ত কিছু করা। বিনিময়ে ইলেকটোর‍্যাল বন্ড মারফত তাকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য ধন-জোগাড় করে দেয় এরাই। বর্তমানে স্যুটেড বুটেড দেশি কর্পোরেট যেমন তেমনি কৌপিনধারী ধর্ম-সেন্টিমেন্ট আশ্রয়ী রিলিজিয়াস কর্পোরেশন যেমন পতঞ্জলি (বাবা রামদেব), ইশা ফাউন্ডেশন (সদগুরু), আশারাম বাপু, বাবা রাম রহিম এর ডেরা সাচ্চা, ইসকন ইত্যাদিরও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক।

শ্রম-উৎপাদন-মূল্য-মূল্যবিভাজন-আবশ্যিক-উদবৃত্ত- মূল্য বিন্যাস ও পুনর্বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিচ্ছন্ন কিছু ভাবনা নেই। মূল্যনীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদিও এদের কাছে হেঁয়ালি। এ সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির ছাপ নেই। আছে কী? যেটা আছে তাহল মুক্ত বাজার অর্থনীতির লেজুড় বৃত্তি করা। কর্পোরেট হাউসের কাছে দেশের সম্পদগুলিকে বেচে দেওয়া। তাদের শ্রমমূল্য লুণ্ঠনের ব্যবস্থা পাকা করার এজেন্ট হিসেবে কাজ করা।

সাংস্কৃতিক(?) কার্যক্রম /৮

১৯২৫ সালে এদের সাংস্কৃতিক (!) সংগঠনের স্থাপনাকাল থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিপরীত অবস্থানে থেকে এরা এঁড়েমির শাখানুশীলন করে চলেছে। এদের আইডিয়াল হিটলার-মুসোলিনি! স্বস্তিকা এদের প্রিয় চিহ্ন! এরাও হিটলারের মতই আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় অন্ধ! সেই বিশুদ্ধ রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বাচক অন্ধ ধারণা একটি নেশনকে কোথায় নিয়ে যায় যা একটি অপর ধারণার প্রায় ষাট লক্ষ মানুষকে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে যায়! তা কি এই ইতিহাস দর্শন-শাস্ত্র-জ্ঞান-বিদ্যা-বিচারহীন অর্থডক্স ধারণান্ধরা কি জানে না? হিটলার মুসোলিনির সেই ধারণান্ধতার পরিণাম কি তারা দেখতে পায় না? তাহলে জীবন বিকাশ বিরোধী এই অন্ধত্ব কি কখনও সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক অভিধার দাবি রাখতে পারে?

জীবনের বিকাশ বাচক অভীপ্সাকে সামনে রেখে ভাব-কর্ম-বস্তুর যুগলবন্দী সৃজনশীলতাকেই সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থে প্রয়োগ করা হয়। সেই সৃজনশীলতা কী করে?

বিকাশের বাধাগুলিকে চিহ্নিত করে। তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ফাইন আর্টসের নানান আঙ্গিকে আর্থসমাজের সামনে হাজির করে। আর্থসমাজে গণ উত্তরণ বাচক জীবন অনুশীলনের গাইডলাইন রূপ ইডিওলজির জন্ম দেয়।

শত্রুমিত্র চিহ্নিতকরণ ও মেরুকরণে আর্থসামাজিক অশান্তির কারণ বাচক দুর্যোধনকে পরাজিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা বাচক কুরুক্ষেত্র রচনা করে। সেই কুরুক্ষেত্রে তখন নুন খেয়ে গুণ গাহানো ভীষ্ম সহ কৌরবদের ভরাডুবি হয়। জিতে যায় সংগ্রামী পঞ্চপাণ্ডব! আর্থসামাজিক বিকাশ বাধাহীন হয়! তাই আগামী দিনে এঁড়েমির ধ্বজাধারীদের ঝাড়ে বংশে নিপাত করতে সাংস্কৃতিক কৃৎকলাকার হয়ে ওঠার কোনও বিকল্প নেই।

সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি— ফোকাসে শিক্ষা দপ্তর

উপক্রমণিকা

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের রায় এ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীকে সিবিআই জেরা করছে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে। পরেশ অধিকারী তো আবার নিজের মেয়েকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্যানেলাইজড করে নিয়োগ দিয়েছেন। মেয়েটি চাকুরি খুইয়েছে। আদালত তার 41 মাসের বেতনও ফেরত দিতে বলেছে।

ইতিমধ্যে এসব অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে আন্দোলন ইত্যাদির মধ্যেই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু 5200 টি নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি করে 2016 সালের প্যানেলের অবশিষ্ট (অপেক্ষমান) চাকুরিপ্রার্থীদের জন্য নিয়োগের ঘোষণা করেছেন। সেই নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর পরই আবার আদালতে অভিযোগ দাখিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিচারপতি এই ধরনের পদ সৃষ্টি ও বিজ্ঞাপনকে আই ওয়াশ ও দুর্নীতি ঢাকবার প্রয়াস বলে বর্ণনা করেছেন। ছেলে মেয়েরা কিন্তু তাঁবু খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার রাজপথে বসে রয়েছেন। চাকুরির জন্য।

দুই মন্ত্রীকে সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদ ও মন্ত্রী কন্যার চাকুরি যাওয়ার রায়ের নায়ক বিচারপতি শ্রী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট প্রচার হচ্ছে। তিনি বীর হিসেবে পূজিত হচ্ছেন। কিছুদিন থেকেই তাঁর কার্যকলাপে সরকার পক্ষ অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট মামলায় স্টেকহোল্ডারদের সম্পত্তির পরিমাণ তদন্ত করার প্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি গান্ধী পরিবারের সম্পত্তির প্রসঙ্গে চলে যান। বীর রূপে পূজিত শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে অতঃপর কেবল সরকার পক্ষই নয় অন্য নিন্দুকরাও সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এই পরিস্থিতিতে বাম জমানায় চিরকুট দিয়ে চাকুরি হতো বলে জনসভায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ভদ্রতা করে তিনি সেইসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি। এখন তিনি সব সামনে নিয়ে আসবেন। তা তিনি নিয়ে আসুন। কিন্তু পরিবর্তনের জমানায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতি প্রসঙ্গে অনিয়ম ও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না এই মর্মে তিনি কোন বিবৃতি দিতে পারলেন না। এমনকি আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অন্যান্য সিচুয়েশানে যেমন আইন আইনের পথে চলবে বলে বিবৃতি জারি করেন এক্ষেত্রে তাও করেননি।

বিরোধী রাজনীতির কুশীলবরা বর্তমান এসএসসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলে রুলিং এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর সমাজের একাংশ এবং ওই অংশের শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করবার রাজনীতি সংক্রান্ত অ্যাক্টিভিটি ব্যাপক সাধারণ জনতাকে বিশেষ প্রভাবিত করছে বলে দেখা যাচ্ছে না।

2011 সালে বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। তারপর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ প্রাথমিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামনে এসেছে। একের পর এক স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পরিবর্তিত হয়েছেন। 2011 সাল থেকে 2021 সাল এই 10 বছরে মোট সাতজন চেয়ারম্যান কাজ করেছেন। সাতজনের মধ্যে কেউবা স্বেচ্ছায় কেউবা সরকারের ইচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রতিটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ঘিরে নানান ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির ফাঁকফোকর। এর ভিত্তিতে আদালতে একের পর এক কেস হয়ে চলেছে। যার ফলে 2012 সালের 12 তম আরএলএসটি থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যতগুলো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে সামনে এসেছে যে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগের বিষয়টিকে স্বচ্ছ দুর্নীতি মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

দেশব্যাপী ব্যাপক বেকারত্বের পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে সরকারি ভাবে শিক্ষক নিয়োগের যে পরীক্ষাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হতো সেগুলি এরাজ্যের ছেলেমেয়েদের নিজেকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্নের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রটির এরকম দশা হওয়ায় শিক্ষিত যুবক যুবতীরা যারপরনাই হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছেন। স্বপ্ন নেই, আশা নেই। কেবলই বালুচর!

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে। এছাড়াও 29 টি দপ্তর নানান পদ্ধতিতে চুক্তিভিত্তিক বা স্থায়ী যে ছিটেফোঁটা নিয়োগ করে থাকেন সেখানেও নানান রকম দুর্নীতির থাবা বসেছে। পরিণামে নিয়োগের আকালের বাজারে দুর্নীতির এই সকল

কাণ্ডকারখানায় রাজ্য রাজনীতি ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠছে। প্রতিবছর স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে আসছেন তারা কোন ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রম-নিয়োজিত করবেন তার কোনো দিশা নেই। মুক্তবাজার অর্থনীতি চালিত এই দেশ, এই রাজ্য মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মকানুন অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে দুর্নীতি মুক্ত হতে পারে তার কোন দিশা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নেই। থিওরি অফ নেগেটিভ নেগেশন অফ নেগেশন তত্ত্বে আজকের অপজিশন আজকের শাসককে সরিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চায়ছে। আজকের শাসক যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যস্ত। মাঝখান থেকে চাকুরি প্রত্যাশী বা কর্মপ্রার্থীরা আরো দিশাহীনতায় ভুগছে।

এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের চিত্রটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

বাম জমানা

কৃষিক্ষেত্রে তেভাগা আন্দোলন, 42 এর খাদ্য আন্দোলন এবং ষাট সত্তর দশকের ছাত্র আন্দোলনকে ভিত্তি করে এ রাজ্যে বামপন্থী রাজনীতি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ প্রতিষ্ঠার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছিল 1977 সালের নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে।

ক্ষমতায় এসে প্রথম কুড়ি বছরে সিপিএম শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি নিয়োগে তার সাংগঠনিক ক্যাডারদের ঢুকিয়ে ছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই 1977 থেকে 1997 এই কুড়ি বছরে তারা তাদের পার্টি সংগঠনকে এই সমস্ত নিয়োগের মধ্যে দিয়েই পাকাপোক্ত করেছিল। সেখানে মেধা এবং যোগ্যতা প্রাধান্যকারী ছিল না, প্রধান বিষয় ছিল পার্টি আনুগত্য। যার ফলে এই কুড়ি বছরে রাজ্যে বামফ্রন্ট না বলে বলা ভালো সিপিএমের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নুন খেয়ে গুণ গাওয়া অর্থাৎ পার্টি'র ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি হিসেবে কমিটেড কর্মী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। যুক্তি দেওয়া হবে যে সেই সময় স্কুল পরিচালন কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। ফলে স্কুল পরিচালন কমিটি বা কলেজ পরিচালনা কমিটি কাকে নিয়োগ করবেন তা সম্পূর্ণ তাদের আওতায় থাকতো। যাই হোক ধীরে ধীরে বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতম আকারে পৌঁছনোর একটি পর্যায়ে তারা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন তৈরি করলেন 1997 সালে। এই আইনের বলে 1998 সাল থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়মিতভাবে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করলো। দু এক বছর বাদে 1998 থেকে 2011 প্রায় প্রতি বছরই স্কুল সার্ভিস কমিশন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও পরীক্ষা নেওয়ার কাজ সম্পন্ন করে এসেছে। নিয়োগের সংখ্যা যাই হোক রেগুলারিটি মেনটেন তারা করেছিল।

এই দশ বছরে মোট কত শিক্ষক তারা নিয়োগ করেছিল? সাল ওয়াইজ তার একটি ব্রেকআপ দেবার চেষ্টা করা যাক। সঙ্গে এটাও দেওয়া দরকার যে, যে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়ে এত ঢক্কা নিনাদ চতুর্দিকে চলছে আসলে কতটুকু কর্মসংস্থান করবার যোগ্যতা রাখে? ব্যাপারটা কি এমন যে এখানে লক্ষ লক্ষ নিয়োগ ঘটানো হয় বা ঘটানো সম্ভব? দেখা যাক।

1998 সাল থেকে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলো তাতে রাজ্যের জেলাগুলোকে পাঁচটি রিজিওনে ভাগ করা হয়েছে। পরীক্ষার নাম দেওয়া হয় আর এল এস টি অর্থাৎ রিজিওনাল লেভেল সিলেকশন টেস্ট। উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল আর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগের হিসেবটি কেমন? দেখা যাক—

Sl No	Year & RLST	No of Candidates	No of Empanelled Candidates
1	1998 & 1st RLST	246315	8072
2	1999 & 2nd RLST	302544	10957
3	2001 & 3rd RLST	309307	12641
4	2002 & 4th RLST	260028	9980
5	2004 & 5th RLST	261452	8658
6	2005 & 6th RLST	237496	14267
7	2006 & 7th RLST	415000	20887
8	2007 & 8th RLST	350656	10332
9	2009 & 9th RLST	-	12931*
10	2010 & 10th RLST	-	13677*
11	2011 & 11th RLST	-	11723*
TOTAL			134125

তথ্যসূত্রঃ Annual Report School Education Department, West Bengal (1998-99 to 2007-08)। * তারকাচিহ্নিত বছরগুলির তথ্য Annual Report এর ভিত্তিতে পাওয়া যায়নি। Advertisement ও অন্য সোর্স থেকে প্রাপ্ত।

একটি কথা এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই পর্বে যে সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন প্রকৃত নিয়োগের সংখ্যা কিন্তু তত সংখ্যক নয়। কারণ এই পর্বে ফ্রেসার ক্যান্ডিডেটদের সাথে ইতিমধ্যে নিযুক্ত অর্থাৎ ইন সার্ভিস শিক্ষকরাও পরীক্ষা দিতেন এবং নিন্দুকরা এটাই বলে যে সরকার কম নিয়োগ করবার অভিপ্রায় সফল করতে তাদের

অধিকাংশকেই পাস করিয়ে দিতেন। আনুমানিক ভাবে বলা যায় প্রতি 100 জনে 40 জন ইতিপূর্বে নিযুক্ত ইন সার্ভিস শিক্ষকরাই পুনরায় এম্পানেলড হতেন। তারা এটা করতেন তাদের পছন্দসই স্কুলে নিয়োগ পাবার জন্য। সেই সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ট্রান্সফারের কোন পৃথক ব্যবস্থাপনা ছিল না।

এই পর্বে 1999 সালে থেকে 2007 সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 8 বার। তাতে মোট 7861 জন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে 13 বছরে (1998-2011) মোট নিযুক্তি 134125 জন। সাকুল্যে 80-90 হাজার মতন শিক্ষক এই পর্বে নব নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ সংখ্যা হিসেব করা হয়নি। কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা।

পরিবর্তনের জমানায় নিয়োগ 'কাণ্ড'

এই পর্বে নিয়োগ নিয়ে চরম ডামাডোল উপস্থিত হয়েছিল এবং তা আজও চলছে। দ্বাদশ আরএলএসটি (2012) কোনোক্রমে হয়ে যাওয়ার পর থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন মারফত রেগুলার নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। 2012 এর পর 2016 সালে প্রথম এসএলএসটি এর বিজ্ঞাপন হয়েছে। সেখান থেকে কিছু নিয়োগ হয়েছে। ওদিকে চার বছর এবং তারপর 2022 পর্যন্ত অর্থাৎ 6 বছর ব্যবধান পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি হয়নি। অর্থাৎ এই 10 বছরে মাত্র দুটি বিজ্ঞাপন আর সেই বিজ্ঞাপন ঘিরে নানান কোর্ট কেসের ছুতোনাতা! 10 বছরে ন্যূনতম 9 লক্ষ গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েছে! এদের পরীক্ষা দিতে দেয়নি সরকার! একটি আপার প্রাইমারি টেট নিলেও (2015) আজ পর্যন্ত নিয়োগ দিতে পারেনি। প্যানেল তৈরি হয়ে গেলেও হাইকোর্ট সেই প্যানেল দুর্নীতির অভিযোগে বাতিল করেছে। গোটা ব্যাপারটি এখন বিশ বাঁও জলের মধ্যে।

2012 ও 2014 সালে দুটি প্রাথমিক টেট পরীক্ষা থেকে কিছু নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু তা নিয়েও বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ কোর্ট কেস পালটা কেস লেগে আছে। 2017 সালে আরেকটি প্রাইমারি টেট পরীক্ষা সরকার নিয়েছে । গত জানুয়ারিতে তার ফল প্রকাশ হয়েছে এখনও নিয়োগ হয়নি। এদিকে 2020 সালে নভেম্বর মাসের জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি থেকে টেট-2014 সাল থেকে আরও 16500 জন নিযুক্ত হবার খবর রয়েছে। নিয়োগের থেকেও ন্যাক্কারজনক হল প্রতিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে কেস-ভোগান্তি আর চাকুরি প্রার্থী তরুণ যুবদের পকেট কাটার খেলা।

একনজরে নিয়োগের হিসেবটি দেখে নেওয়া যাক—

Sl No	Year & Name of Exam	Advt. No.	No. of Va-cancy	Date of Exam & No. of Candi-dates	No of Empan-elled Candi-dates
1	2012 & 12th RLST	01/AT/11,dated 29/12/2011	46140	29/07/2012; 570911	29575
2	2016 & 1ST SLST	860/6602/ CSSC/ ESTT/2016 & 861/6602/ CSSC/ ESTT/2016 dated 23/09/2016	16529	27/11/2016	20749
3	2015 & UPPER PRIMA-RY	1090/5278 (III)/ CSSC/ ESTT/2015 dated 10/06/2015	13080	16/08/2015	SUBJUDI-CE
4	2016 & 3RD RLST (NT)	01/NT/2016 dat-ed08/08/2016	6012	19/02/2017 & 05/03/2017	5860
5	2012 & PRIMA-RY TET	285-SE(EE)/ P/10M-6/09(pt) dated 24/07/2012	-	26/08/2012	34577
6	2014 & PRIMA-RY TET	673/BPE/2015 dated 25/05/2015	42949	11/10/2015	42621
7	2017 & PRIMA-RY TET	1167/BPE/2017 dated 12/05/2017	-	31/01/2021	Result Published
8	2020 & Re-appoint-ment from TET 2014	517-SE/EE/P-6/09 (Pt), TET dated 23/11/2020	-	23/11/2020	16500 on going
	TOTAL		-		149882

সূত্রঃ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও কোর্টে দাখিলকৃত হলফনামা

তাহলে কী দাঁড়াল ? উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে—
12th RLST 2012 থেকে নিয়োগ হয়েছে 29575 জন ।
1st SLST 2016 থেকে নিয়োগ হয়েছে 20749 জন।
3rd RLS(NT)-2016 থেকে নিযুক্ত হয়েছেন 5860 জন।
প্রাথমিক TET-2012 34577 জন নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রাথমিক TET-2014 থেকে 42621 জন। মোট 133382 জন। প্লাস প্রাথমিকে আরোও 16500 জন। অর্থাৎ 149882 জন।

অর্থাৎ বর্তমান রাজ্য সরকারের দশ বছরের (2011-2021) শাসনকালে রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক,মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 149882 জন শিক্ষিত যুবক যুবতীদের চাকুরি পেয়েছেন। মোট পরীক্ষার্থী কত হতে পারে? কমপক্ষে 25-30 লক্ষ। কত শতাংশ নিয়োগ? 3-4 শতাংশ। আগের ক্ষেত্রেও (1998-2011) পর্বে মোট নিযুক্ত শিক্ষক আর মোট পরীক্ষার্থীর অনুপাতটি কী? কত শতাংশ নিয়োগ? সেই 3-4 শতাংশ। তাহলে বাকি ছেলেরা কোথায় যাবে? যাচ্ছে কোথায়? কেউ হিসেব রাখে? এই প্রশ্নটিই রাজনৈতিক প্রশ্ন। কোনো দল কি তুলছে?

প্রসঙ্গ দুর্নীতি

লেখার সূচনাতেই বলা হয়েছিল দুর্নীতির কথা। যার জন্য বর্তমান শাসক দলের মন্ত্রীরা সিবিআইয়ের রাডারে পড়েছে। কোর্ট নানান ভাবে ভর্ৎসনা করে চলেছেন। কিন্তু ঐ যে জনশ্রুতি আছে না, তোরা যতই যতই বল আমি কান করেছি ঢোল। ফলে কোর্ট যাই বলুক কে তোয়াক্কা করে!

সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তা হাইকোর্ট নিযুক্ত রিটায়ার্ড জাস্টিস আর কে বাগ ডিভিশন বেঞ্চের কাছে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন। বাগ কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার নন টিচিং 381 জনের প্যানেলের মধ্যে 221 জনের নাম ঢোকানো হয়েছে। তাদের নাম এমন কি অপেক্ষমান তালিকায় পর্যন্ত ছিলনা। এরপরই গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তদন্তের জন্য সিবিআইকে দায়িত্ব দেয় হাইকোর্ট।

অঙ্কিতা অধিকারী অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়েকে ওয়েটিং লিস্ট (AT) থেকে অনিয়ম করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তা ছিল অবৈধ। হাইকোর্ট তার নিয়োগ বাতিল করেছে। তার চাকুরির মেয়াদ 41 মাস। এই 41 মাসের বেতন তাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সিবিআইকে গোটা নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য হাইকোর্ট বরাত দিয়েছে। সিবিআই তদন্ত করছে।

অর্থাৎ বড় কথা হচ্ছে এটাই যে সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন সমস্ত কাণ্ড সংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যাতে করে মাঝপথেই হয় পরীক্ষার্থীরা অথবা বিরোধীরা অথবা সরকার পক্ষের লোকেরা আদালতে গিয়ে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করছেন। পরিণামে নিয়োগ হচ্ছে না। ছেলেমেয়েরা বছরের পর বছর বসে থাকছেন। 'সেই সব কাণ্ড' যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তার অর্থ কী? তার অর্থ নানান বেআইনি নিয়মবহির্ভূত ব্যাপার স্যাপার। যার নাম দুর্নীতি।

এসএসসি দুর্নীতির রুট প্রসঙ্গে CAG রিপোর্ট

Report of the Comptroler and Auditor General of India on General and Social Sector for the year ended March 2017 এর প্রতিবেদন থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতির ধারাবাহিকতার একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি এই অডিট প্রতিবেদনটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। CAG অডিট করেছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইটি সেকশনের। তাতেই দুর্নীতির রুটটি খুব সুন্দরভাবে তুলে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

1997 সালে তৈরি হওয়া স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনের ভিত্তিতে 1998 সাল থেকে যে পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় তার জন্য পরীক্ষা নিয়ামক কর্তৃপক্ষ এবং পরীক্ষার পদ্ধতি ও পরিকাঠামো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। CAG স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আওতায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের অডিট করতে গিয়ে জানাচ্ছেন অযোগ্য প্রার্থীদের বেআইনিভাবে সুযোগ করে দিতে কমপিউটারাইজড সিস্টেমের ঘাটতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। সুবিধামতো কাস্ট ক্যাটাগরি চেঞ্জ করা হয়েছে, একাডেমিক স্কোরের মান বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষার মার্ক বাড়ানো হয়েছে এবং এ থেকেই পরিষ্কার হয়েছে যে নানান ভাবে এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি rooted থেকেছে।

CAG অডিটে এসএসসি প্রদত্ত এসএলএসটিগুলির ডাটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে নিচের টেবিল থেকে দেখা যাবে কীভাবে দশম আরএলএসটিতে (২০১০) বিরাট সংখ্যক ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে একাডেমিক স্কোর যা হিসেব করা হয়েছে তার সাথে সত্যিকারের নম্বরের গরমিল—

অডিট রিপোর্ট এর 2.4.2 টেবিলটি পরের পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা হলো।

এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম কোনভাবেই নির্দিষ্ট অংকের যোগফল ভুল করতে পারে না। টেবিলে উল্লিখিত তথ্য এটা প্রমাণ করে যে ডাটা ম্যানুপুলেট করা হয়েছে। এই ধরনের ম্যানুপুলেশন এর ফলে অযোগ্য প্রার্থীদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

একাদশ আরএলএসটি (2011) এর ক্ষেত্রে এমন 43 জন ক্যান্ডিডেটকে পার্সোনালিটি টেস্ট এর জন্য ডাকা হয়েছিল যাদের একাডেমিক মার্কস সিস্টেমে উল্লেখই ছিল না। এই

অঞ্চল	পূর্বাঞ্চল	উত্তরাঞ্চল	দক্ষিণাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল
ক্যান্ডিডেট সংখ্যা	61722	102059	60536	120420	61410
কত সংখ্যক ক্যান্ডিডেটের একাডেমিক স্কোরে গোলোযোগ। তার মধ্যে কতজনের—	6493	11021	8034	12553	8546
নম্বর বেড়েছে	3655	6561	4712	12553	5489
নম্বর কমেছে	2838	4460	3322	0	3057
অডিটে যাদের একাডেমিক নম্বরে গোলযোগ ধরা পড়েছে তাদের কতজন ফাইনালি নিয়োগ পেয়েছে	429	479	483	641	451

2.4.2 টেবিল। সূত্রঃ সিএজি রিপোর্ট, মার্চ ২০১৭

43 জনের মধ্যে 28 জন ক্যান্ডিডেট এম্পানেলড হয়েছিলেন। 2264 জন ক্যান্ডিডেটের একাডেমিক মার্কস 1 থেকে 24 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এদের মধ্যে 1596 জন ফাইনালি এম্পানেলড তালিকা স্থান পেয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের বয়স নিয়েও গরমিল রয়েছে। ফার্স্ট আরএলএসটি ফর নন টিচিং স্টাফ, সেকেন্ড আরএলএসটি ফর নন টিচিং স্টাফ এবং দশম (2010) একাদশ (2011) ও দ্বাদশ (2012) আরএলএসটি (অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার) নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপিত বয়স (37 বছর) নানান ভাবে ভায়োলেট করার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। এরকম 2367 টি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাদের ক্ষেত্রে বয়সের গোলমাল মারাত্মক। প্রথম আরএলএসটি নন টিচিং, একাদশ আরএলএসটি (2011) এবং দ্বাদশ আরএলএসটি (2012) এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে 2967 ঘটনায় তাদের জন্য প্রযোজ্য ক্যাটাগরি সিস্টেমেই ছিলনা।

টেবিল 2.4.3 এখানে সংযুক্ত করা হলোঃ

ক্রমিক নং	অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য	কতগুলি ক্ষেত্রে ঘটেছে
1	পরীক্ষা স্টাটাস দেখাচ্ছে অসফল কিন্তু পার্সোনালিটি টেস্টে ডাকা হয়েছে	376 (একাদশ আরএলএসটি 2011)
2	মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন ঘর ফাঁকা	4266 (একাদশ আরএলএসটি 2011)
3	নাগরিকত্ব উল্লেখ নেই	698 [(10 জন ফাইনালি নির্বাচিত হন) দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এটি ও এন টি]
4	লিঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি	95 (একাদশ দ্বাদশ এ টি ও প্রথম এন অটি)
5	প্রাপ্ত নম্বর শূন্য কিন্তু একাডেমিক স্কোর শূন্যের বেশি	12721 (একাদশ আরএলএসটি 2011)
6	সিস্টেম নির্ণীত একাডেমিক স্কোর ও অডিটে হিসাবকৃত প্রকৃত স্কোর ম্যাচ করেনি	6305 (একাদশ আরএলএসটি 2011)

2.4.3 টেবিল। সূত্রঃ সিএজি রিপোর্ট, মার্চ ২০১৭

অডিট রিপোর্টে সংযুক্ত টেবিল 2.4.4 থেকে দেখা যাচ্ছে— ডাটাবেস নরমালাইজেশন প্রক্রিয়ায় যতসংখ্যক টেবিল হওয়ার কথা তার থেকে বেশি ডুবলিকেট এবং ফাঁকা টেবিল সংযুক্ত করা হয়েছে।

RLST	Total No of Tables in the Database	Duplicate Tables	Blank Tables
10th RLST (AT) 2010	462	10	128
10th RLST (HM)	75	1	16
11th RLST (AT) 2011, 11th RLST (HM),12th RLST (AT) 2012, 1st SLST (NT)	378	130	135

2.4.4 টেবিল। সূত্রঃ সিএজি রিপোর্ট, মার্চ ২০১৭

অডিট রিপোর্টের উপসংহারে AG জানাচ্ছেঃ

১. স্বচ্ছতা ও সুস্থ প্রতিযোগিতার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং একাডেমিক স্কোরে প্রাপ্ত নম্বর ম্যানুপুলেট করা হয়েছে। অযোগ্য প্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্টে ডাকা হয়েছে এবং তারা এমপ্যানেল্ড হয়েছেন। যেখানে বেশি নম্বর প্রাপ্ত প্রতিযোগীরা বাদ পড়েছেন। এটি করা হয়েছে সিস্টেমকে ওভাররাইড করার মাধ্যমে। এবং সিস্টেমের সীমাবদ্ধতাকে অপকাজে লাগানো হয়েছে। এতে করে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং অ্যাক্যাডেমিক স্কোরে ম্যানুপুলেট করে অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২.এসএসসি কোন রকম সিস্টেম ডেভলপমেন্ট ডকুমেন্টেশন ও ডাটা ডিকশনারি মেন্টেন করেনি। যার ফলে সিস্টেমে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ পেয়েছে।

৩. এসএসসি তার অফিসগুলির সঙ্গে যোগাযোগের কোন নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি যাতে করে কনফিডেনসিয়াল ডাটা লিক না হয়।

৪. এসএসসি উপযুক্ত কার্যকরী ও মৌলিক নিয়ম ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারেনি। যার ফলে সিস্টেম ক্যালকুলেটেড পার্সেন্টেজ অফ একাডেমিক মার্কস ম্যাচ করেনি ফর্মুলা বেস পার্সেন্টেজ ব্যবস্থার সাথে। পরীক্ষায় স্ট্যাটাসে আনসাকসেসফুল থাকলেও পার্সোনালিটি টেস্টে ডাকা হয়েছে। রিলিজিয়ান, জেন্ডার, সিটিজেনশিপ প্রভৃতি ম্যান্ডেটরি ফিল্ডগুলি ফাঁকা থাকলেও সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৫. পরবর্তী প্রয়োজনে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা (ফিজিক্যাল কপি এবং সফট কপি) ঘেঁটে রাখা হয়েছিল।

এইভাবে এসএসসির নিয়ামক কর্তৃপক্ষ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের নানান ধরনের ভায়োলেশন করে গোটা প্রক্রিয়াটা অস্বচ্ছ ও অন্ধকারের বিষয় করে তুলেছিল। এই যে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থার আড়ালে ঘুরপথে দুর্নীতি করার রাস্তা তৈরি করা- এটি বামেরা সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিল। পরিবর্তিত জামানায় বর্তমান শাসকরা সেটিকে Taken for Granted ধরে তাদের কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেছেন। আগে যা ছিল প্রধানত 'আনুগত্য'বা 'পার্টি আনুগত্য' বর্তমানে তা 'অর্থ আনুগত্যে' রূপ নিয়েছে। এই যা পার্থক্য।

উল্লেখ যে, সিএজির কাছে জমাকৃত তথ্য একাদশ আরএলএসটি পর্যন্ত নিয়োগ বাম জমানার এবং দ্বাদশ ও তৎপরবর্তী আরএলএসটি তৃণমূল জমানার।

দুর্নীতি কেন হয়?

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কয়েকটি মাত্র কর্পোরেট হাউসের কাছে আর্থসমাজের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়। পরিণামে অর্থসমাজ সম্পদ শূন্য হয়ে পড়ে। আবার সেই কর্পোরেট হাউজের অঙ্গুলিহেলনে চলা সরকারগুলি কর্পোরেটি ধনের পাহাড়কে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রপার সিকিউরিটি দিয়ে জনতার কাছ থেকে নানান ধরনের শোষণমূলক কর আদায় করে রাজপাট চালায়। নেপথ্যে থেকে যায় কর্পোরেটি মহাপ্রভুদের কাঁড়ি কাঁড়ি ধন।

গণতন্ত্রের মাথাপিছু ভোট কারসাজিতে আর্থসামাজিক কর্তৃত্বে যারা ক্ষমতার মসনদে বসে তারা তখন ট্যাক্সের টাকায় নানান জোড়াতালি মার্কা প্রকল্প ও সরকারি মোচ্ছব চালু করে। আর্থসমাজে শ্রেণি বিভাজন প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কতিপয় আপার ক্লাসের বিলাসী বৈভব বাদ দিলে বাকি সমাজটা নানান অভাব-অভিযোগ নোংরা-বিকৃতির তমসাচ্ছন্ন এক পুঁতিগন্ধময় বিবিমিশা হয়ে ভেসে থাকে। এদের সামনেই প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ঝরিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কব্জা করা হয়।

যারা ক্ষমতা হস্তগত করে তাদের কারোর থাকে সংগঠিত পার্টি বাহিনী। কারুর আবার তথাকথিত ক্যারিশম্যাটিক নেতা-নেত্রী।

আর্থসমাজিক সম্পদ ধনরূপ নিয়ে কর্পোরেট হাউসে বন্দি হয়ে পড়লে শ্রম ক্ষেত্রে নতুন সম্পদ বিনিয়োগ না হওয়ায় নতুন কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠে না। ব্যাপক সংখ্যক কর্মক্ষম যুবক যুবতি উদবৃত্ত হয়ে যায়। একাডেমিক শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করতে পারে না বলে বছর বছর শ্রম ক্ষেত্রে এরা ভিড় বাড়ায়।

বাঙালি মন ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকেই সরকারি চাকুরিকে তার মোক্ষ মনে করে। কিন্তু সরকারি চাকুরি অপ্রতুল হওয়ায় সে কী করবে? কেন্দ্র রাজা সবক্ষেত্রেই সরকারি চাকুরি ক্রমশ তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় যেটুকু আছে তাতে যেনতেন প্রকারে নিযুক্ত হতে হবে। যদি টাকা দিতে হয় দেব। যদি আনুগত্য দিতে হয় দেব। আনুগত্যের ব্যাপারটি একসময় হয়েছে (১৯৭৭-২০১১)। এখন টাকা! এইখানে নিহিত চাকুরি দুর্নীতির রুট।

যদি সংগঠিত পার্টি বাহিনী থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে লোক নিয়োগ হয় পার্টি আনুগত্য নির্ভর। সেখানে দুর্নীতি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা যায়না।

কিন্তু যদি সাংগঠনিক পার্টি না হয় তাহলে দুর্নীতি অর্থ নির্ভর হয়। যেমনটা এখন হচ্ছে। এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে ধরা পড়ে। অর্থাৎ বলবার কথা এটাই যে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালিত

আর্থসামাজিক বাস্তবতা কখনো দুর্নীতি মুক্ত হতে পারেনা। যতক্ষণ না আর্থসামাজিক উদবৃত্ত মূল্য পুনরায় বিনিয়োগ হতে পারে ততক্ষণ দুর্নীতি।

তুমি কর্পোরেট রাক্ষসদের ধনের প্রহরা দেবে আবার বেকারত্ব দূর করবে তা হতে পারে না। তোমার এজেণ্ডায় সেই দুর্যোধন (ধনের আবর্জনা) সামাজিকীকরণ করবার কর্মসূচি থাকবে না আবার তুমি আর্থসমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করবে এটা হবে না।

তাই আর্থসামাজিক সম্পদ ধন রূপে কুক্ষিগত হতে থাকাটাই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। এই দুর্নীতি বন্ধ না করে ছিটেফোঁটা ছিঁচকেচুরি, পকেটমারি প্রভৃতিকে দুর্নীতি বলে দাগিয়ে দিয়ে তাই নিয়ে মোচ্ছব শুরু হয়ে গেলে আড়াল থেকে মুচকি হাসে রক্ষণকামিতা। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লেখিত ছিঁচকেচুরি, পকেটমারি তথা সামাজিক নৈতিকতাকে ঘেঁটে দেবার কাণ্ড যদি শিক্ষা বিভাগে করা গেলে তো আরও ভাল। রক্ষণকামের দুর্নীতির আঁতুড়ঘর চেনা ও চেনাবার কাজটি যে এই শিক্ষা বিভাগের। কিন্তু শিক্ষাবিভাগকে কলঙ্কিত করতে পারলে সরস্বতী হয়ে আর্থসামাজিক পুঁতিগন্ধময়তার কারণ ও তার প্রতিকার পরতে পরতে খুলে দেখাবার লোক থাকবে না! রক্ষণকাম এই তো চায়। প্রশ্ন হল এই দুর্নীতি থেকে তথা আর্থসমাজকে যাবতীয় অশান্তি থেকে মুক্ত করার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কার্যাবলী প্রণয়নের দায়িত্ব রহিত রাজনৈতিক দলগুলো সেই দুর্নীতির বশংবদ ভৃত্য মাত্র। তাহলে প্রভু ভৃত্যের এই খেলায় জনতার ভূমিকা কী? তা কি কেবল মব রূপে হাততালি দেওয়া নাকি চেতনার অতল থেকে উঠে এসে এইসব চৌর্য্যের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করা।

সেই প্রস্তুতি নিতে গেলেই আর্থসামাজিক শত্রু মিত্র পরিষ্কার ভাবে চেনা যায়। তখন কোনটা দুর্নীতি আর কোনটা নীতি আর তা কীভাবে আর্থসামাজিকভাবে মোকাবিলা করতে হয় তার প্রজ্ঞা সেই মানুষের জীবনচর্চার মধ্যে থেকেই আহরিত হতে থাকে। কর্পোরেটরূপী রক্ষণকামিতা এই ধরনের জীবনচর্চা কে ভয় পায়। ভয় পায় বলেই হুজুগে মাতিয়ে দেবার জন্য সব সময় কোন না কোন ইশ্যু খাড়া করে।

অতঃকিম

ব্যাপক জনতার শ্রম চুরি করে যে কর্পোরেটের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমা হয়েছে তার সামাজিকীকরণ না হলে আর্থসামাজিক সম্পদ অপ্রতুল হবেই। নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে না। নিয়োগ হবে না। তথাকথিত রক্ষণকামী উদার অর্থনীতির হাত ধরে নানান দুর্বলতা খাড়া হবে। যা শেষ পর্যন্ত সামাজিক নৈতিকতার বারোটা বাজাবে। আইনকেও বুড়ো আঙুল দেখাবে। আদালতের চক্করে চক্করে অমূল্য যৌবন নষ্ট হবে। অতঃপর তরুণ যুব ও শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের ভাবতে হবে কেন এমন হচ্ছে, কেন এমন হয়। কেউ ভেবে দেবে না।

নাকি এক বাঘের মুখ থেকে ক্ষমতা অন্য ঘোগের ঘরে ফেললেই ষোলো কলা পুরণ হবে? দৃষ্টান্ত কিন্তু অতি নিকটেই আছে। 2014 সালে নির্বাচন করা হল যাকে 2022 এ তার রূপ? 2011-12 তে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার প্রধানমুখ কিন্তু সেই ছিল।

তথ্যসূত্র:

1. School Education Department Annual Report 1998-99 (Govt. Of WB Publication)।
2. School Education Department Annual Report 2004-05 (Govt. Of WB Publication)।
3. School Education Department Annual Report 2007-08 (Govt. Of WB Publication)।
4. Overview of School Education in West Bengal; July 2008 (Govt. Of WB Publication)।
5. CAG Report 2016-17 (Comptroller and Auditor General of India Publication)।
6. www.karmasandhan.com/assistant-teacher-in.../1758।
7. Trisha Bhattacharjee vs The State of West Bengal & Ors মামলা। indiankanoon.org/doc/171875307/
8. www.ineedjobalerts.in/west-bengal-central-school.../।
9. www.karmasandhan.com/assistant-teacher-in-west-bengal-ssc/1758।
10. www.karmasandhan.com/34559-primary-teacher-in-west-bengal/1180।
11. wbxpress.com/recruitment-primary-teachers-tet-2014/।

সুতপা চৌধুরী কাণ্ডঃ সমাজ যখন খুনের ছাড়পত্র দেয়

১

সুশান্ত চৌধুরী খুন করেছে তার প্রাক্তন প্রেমিকা সুতপা চৌধুরীকে। প্রকাশ্য দিবালোকে। উপস্থিত ভিড়ের মাঝে পিস্তল (খেলনা পিস্তল) উঁচিয়ে জনতাকে কাছে ঘেঁসতে না দিয়ে। বেচারা মেয়েটি একের পর এক ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়। স্থান বহরমপুর গোরাবাজার।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী 'সম্পর্কের টানাপোড়েন' বা বলা যায় প্রেমিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়াই এই নৃশংস খুনের কারণ!

খুন ও খুনির গ্রেফতারের পর পরই নেটমাধ্যমে এনিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। উল্লেখ্য যে খুনির সপক্ষেও জনতা মত দিচ্ছে। এবং মেয়েটির দিকে আঙুল তুলছে। এ সংখ্যাটা কিন্তু বিরাট!

একটু বিশ্লেষণে আসা যাক।

২

ছেলে মেয়ে প্রেম করবে এটি আবহমান কথা। প্রেম করল মানে দাসখত লিখে দিল এটি আবহমান কথা নয়। এটি কাজের কথাও নয়। অথচ প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সমাজ এরূপ মনোভঙ্গি প্রদর্শন করে। এর কারণ কী? এর কারণ নিহিত আছে নর-নারী তথা দাম্পত্য সম্পর্ক বা যৌনসম্পর্ক বিষয়ক রক্ষণকামী বৈষয়িকতার মধ্যে। ব্যাপারটি কী রকম?

কেউ কাউকে পছন্দ করল বা পারিবারিকভাবে বিবাহ ব্যবস্থাপনা হল। মন্ত্র পড়ানো হল। মানে একে অপরের সম্পত্তি বনে গেল। এই হল ব্যাপার! একটু পিছিয়ে গিয়ে নানান সামাজিক-ধর্মীয় রীতি (হিন্দু বা মুসলিম) বিশ্লেষণ করলেই এই সম্পত্তি বোধের পরিচয় মিলবে। আসলে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানার সত্তাবেষ্টন সমাজে নারী বা নর উভয়কেই পরস্পরের কাছে ব্যক্তিমালিকানাধীন 'মাল' বা 'সম্পত্তি' মনে করতে শেখায়। এটি শেখালে রক্ষণকামের কী লাভ হয়? যে-সে লাভ নয়, বিরাট বড় লাভ হয়! সেটি কেমন?

৩

আর্থসামাজিক শ্রম-সম্পর্কের রূপ ও যৌন প্রেম

শ্রম-সম্পর্কের বর্তমান স্বরূপ নিশ্চয়ই ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক। এতে উৎপাদিত মূল্যের বিজ্ঞানসম্মত বিভাজন ও বিন্যাস ঘটাতে দেওয়া হয় না। মুক্তবাজার অর্থনীতির খপ্পরে জোর যার মূলক তার এই হল নীতি। শ্রমের উদবৃত্তমূল্য ব্যক্তিকুক্ষির পাহাড় গড়ে দেয় গুটিকয়েক কর্পোরেটের। আর লক্ষ-কোটি মানুষ জীবনের স্বাভাবিক দাবি অর্থাৎ মানবাধিকার থেকে হয় বঞ্চিত। শ্রমক্ষেত্র গড়ে উঠে না। চাকুরি হয়না। যে কটা নিয়োগ ইতিপূর্বে হয়েছে তার উপর ভীষণ চাপ পড়ে।

শ্রম-সম্পর্কের এই স্বরূপে আমরা কী দেখতে পাই?

১) বেকারত্ব

২) ভিক্ষাবৃত্তি / উঞ্ছবৃত্তি

৩) যৌন বৃত্তি

৪) আর্থসমাজ মানসের নানান বিকৃতি

আর্থসামাজিক স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়। যৌনপ্রেম তথা নারী ও পুরুষ দুই-ই এখানে পণ্য। যার মূল্যমান সম্পত্তি সম্পর্কের রকমফের মাত্র!

জ্ঞান-শ্রম-যৌনতার স্বাভাবিক বিকাশমূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে না দিলে যা হবার তাই হয়। যৌনতা কেন্দ্রিক কতই না বিকৃতি সমাজ মনকে গ্রাস করে তার ইয়ত্তা নেই। দাম্পত্য সঙ্গীকে নিজের দখলিভূত সম্পত্তি গণ্য করাটাও সেই বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

৪

আর্থসমাজ-সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব

ধনের ব্যক্তি কুক্ষির পাহাড় রূপ আবর্জনা (দুর্যোধন) একদিকে, অপরদিকে জীবন শুরু করার ন্যূনতম মূল্য বঞ্চিত মানুষের নোংরা ঘাঁটা জীবন— এই দুই মেরুর জীবন তখন বিকৃত। এই বিকৃতির চরম অভিব্যক্তি ফুটে উঠে যৌন। বিকৃতির নানান ফর্মে। আগেই উল্লেখিত যে এহেন আর্থসামাজিক পটে নর ও নারী দুই-ই পণ্য।

Rationality অর্থাৎ মানবতা বর্জিত Animality অর্থাৎ দানবতাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে তখন দিন গুজরান! কোথা শান্তি, কোথা প্রেম! কোথা জীবন, কোথা দুদণ্ড আরাম! জীবন তখন ভোগ নয়, দুর্ভোগ! এই দুর্ভোগের স্বরূপটিই হল আমিত্বপ্রেমহীন কিষ্কিন্ধা!

৫

কিষ্কিন্ধায় কী কী ঘটে?

তা আগে থেকে বলে দেওয়া যায় না। এটুকু বলা যায় বিকৃত মনে তখন অন্ধকারের নানান ফন্দিফিকির, ধারণার নানান কিচিরমিচির! যেমন, নারীই যত নষ্টের গোড়া! নারীই পুরুষদের নষ্ট করে! প্রেমের খেলা খেলে সে জীবন নষ্ট করে দেয়, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই!

বস্তু অর্থাৎ লক্ষ্যবাচক জীবনগামিতা নারীকে এই অধিকার দেয়না যে সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলায় আর্থসমাজে অবাঞ্ছিত অপরাধ প্রবণতার সংক্রমণ ঘটাতে পারে। পুরুষ

আধিপত্যকামিতার উল্টোদিকে নারীবাদের আগুন। সে মনে করায় যত নষ্টের গোড়া ঐ ‘পুরুষতান্ত্রিক’ সমাজ। নারীর উচ্ছৃঙ্খলাকে সে সংক্রামিত করে। অথচ সে কিন্তু রক্ষণকামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চুপ। তার বিরুদ্ধে নরনারীর মিলিত সংগ্রাম নিয়ে সে নিশ্চুপ। নিশ্চুপ কেন তা পরিষ্কার। আসলে রক্ষ অধিকৃত পুরুষ প্রধান শাসন মানস- আর নারীবাদের আগুন একই মুদ্রার দুই পৃষ্ঠ মাত্র।

আর সেই রক্ষের হাতিয়ার ধর্ম-ধারণার বলিহারি! কারণ তাতেই নিহিত নারীকে আক্রমণের যাবতীয় রসদগুলি! পুরুষতন্ত্রের যুপকাষ্ঠেই নারীর যত অবনমন। যত অশান্তি। অতএব পুরুষের দফারফা করতে হবে। ওদের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার না করলেই নয়। তাতেই তখন বজ্রকন্যার কলম খাড়া— যোনি লোভে জাল কেনে, মাকড়সার ‘চাল পুরুষ।’

৬
কিষ্কিন্ধায় কার লাভ?

শ্রমমূল্য চুরি করে করে ধনের পাহাড় গড়ে যারা তাদের লাভ। তারা কারা? নানান যুগে তাদের নানান নাম। এযুগে তারা বহুজাতিক কর্পোরেট নামাঙ্কিত।

এরা কী করে?

এরা অর্থনীতির বিকাশমুখীন দিকটিকে কব্জা করে অন্ধকারের রাজত্ব চালায়। তারপর সেই রাজত্বটিকে বলবৎ রাখতে আর্থসামাজিক নারী-পুরুষের ভাব জগৎটিকে কলুষিত করে। কীভাবে? নানান ধারণা, ঐতিহ্যের নেতিবাচক সংক্রমণ, অতীন্দ্রিয়তার সংক্রমণ, ধর্ম-ধারণার প্লাবন ইত্যাদির মাধ্যমে।

অর্থনীতিকে আঁধারে কেমন করে নেয়?

শ্রমে উৎপাদিত মূল্যের আবশ্যিক ও উদবৃত্তের দখলদারির মাধ্যমে। উদবৃত্ত দূরে থাকুক আবশ্যিকের নাগাল শ্রমশীল মানুষের তখন দূর অস্ত!

দেহমনে ন্যুব্জ ক্যুব্জ হয়ে পড়া এই মানুষের সামনে গাঁজার কল্কি ধরিয়ে না দিলে তার চলে না। খবর, চ্যানেল, ইন্টারনেট, প্রিন্ট মিডিয়া, সিনেমা ইত্যাদি নামিয়ে সেই কল্কি ধরানোর কাজ চলে।

তার সাম্রাজ্য নিয়ে কারুর কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন করার ক্ষমতা নেই। বাহ, এই তো চাই!

কিন্তু এতেও সে ঠিক থাকতে পারে না।

সে কী করে?

৭
নরনারীর প্রেম তথা দাম্পত্য বিষাক্ত করে

দাম্পত্য বিষাক্ত করতে পারলেই তার নিশ্চিন্তি। কারণ সে জানে, যদিও আজ নানান ফন্দি-ফিকিরে আমিত্ব চেতক মানুষকে সে আটকে দিতে পেরেছে, তার মুক্তবাজার নিষ্কণ্টক করতে পেরেছে। তবুও সেই অন্ধকারের আর্থসমাজ থেকেই নিস্ক্রান্ত হতে পারে তার মৃত্যুবাণ।

আর তা হতে পারে নর-নারীর আমিত্ব প্রেম মূলক জীবন সাধনায়। অতঃপর সেটিকে আটকাতে হবে। তাতেই যুগজীবনায়নী প্রতিভার জন্মদান ঠেকানো যেতে পারে। সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মেধার জন্ম ঠেকানো যেতে পারে।

সেই জন্য দরকার দাম্পত্য তথা নর-নারীর পরশ বাচক পবিত্র সম্পর্ককে কলুষিত করা। তাদের মাথা চিবোনো। তাদের মধ্যে সংক্রামিত করাঃ— ১) যান্ত্রিক যৌনতা ২) জড়সামগ্রী তথা অর্থ-গৃধ মানসিকতার সংক্রমণ করা এবং ৩) দাম্পত্য সঙ্গীকে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি মনে করা। নিঃসন্দেহে মেধা-প্রতিভার ভ্রূণ সঞ্চারণ করে সে ঠেকাতে পারে। পারে কিন্তু কিছুকাল! শেষে তাকে ধরাশায়ী হতেই হয়।

যেমন ঐতিহাসিক সেই সঞ্চারণের দৃষ্টান্ত:

ক) ফ্যারাওয়ের যাঁতাকলেও মোজেসের উত্থান।

খ) অন্ধকার মূর্খতার থেকে রাসুলুল্লাহের উত্থান।

গ) জারীয় অন্ধকারে লেলিনীয় উত্থান।

৮
আজকের কর্তব্য

রক্ষণকামী বেড়াজালের যৌন-সুঁজল চোখ থেকে দাম্পত্য পবিত্রতাকে প্রটেক্ট করতে হবে।

আমিত্ব বিকাশেয় জীবন বোধ গড়ে তুলতে দরকার শ্রমমূল্যের বিন্যাস বাচক মূল্যায়নী দৃষ্টিকোণ। আর সেই দৃষ্টিকোণ গড়তে গেলে রক্ষ আরোপিত ধারণা ও ঐতিহ্যের বেড়াজাল ভাঙতে হবে। তাহলেই রক্ষের আটঘাট মারা দাম্পত্য-কবর ভেদ করা সম্ভব।

প্রেম যেখানে নর-নারীর সম্পর্কের ভিত্তি। প্রেমহীন দাম্পত্য বলে কোনো কথা বস্তু বিজ্ঞানে নেই। আর তাতে কেউ কারো সম্পত্তিবাচক মালসামগ্রী নয়। নর ও নারী স্বতন্ত্র- দুটি এনটিটি আমিত্ব বিকাশে পরস্পর দাম্পত্য সহযোগী। যার ভিত্তি— প্রেম।

রাজ্যের বেসামাল আইন শৃঙ্খলা

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিংসার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়েই চলেছে। রাজ্য রাজনীতিতে অনেকেই এই সব ঘটনাকে ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসা বলে মনে করলেও কিছু দৃষ্টান্ত রাজ্যবাসীকে শিহরিত করেছে।

ঘটনা ১। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। আমতা, হাওড়া।

প্রতিবাদী যুবক আনিস খানের খুন। তার পরিবারসহ বিরোধীদলসমূহ একে পুলিশি হত্যা বলে দাবি করেছে। পুলিশ এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে উক্ত ঘটনার সরেজমিনে অনেক অমিল রয়েছে। আনিস খানের বাবার বক্তব্য অনুসারে একজন পুলিশ উর্দি ও তিনজন সিভিক উর্দি পরিহিত ব্যক্তি আনিস খানের খোঁজে তাদের বাড়ি আসে এবং গানপয়েন্টে রেখে বাড়ি তল্লাশি করে। কিছুক্ষণ পর আনিস খানের ছাদ থেকে পড়ার শব্দ হয় এবং ঐ চারজন পালিয়ে যায়। পরিবারের একজনের দাবি সে শুনতে পায় পুলিশ উর্দিধারীকে একজন বলছে, স্যার কাজ হয়ে গেছে। এই ঘটনায় ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার সিট গঠন করে। তিনজন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়। আনিস খানের পরিবার সিটের উপর ভরসা না পাওয়ায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানায়।

ঘটনা ২। ২১ মার্চ, ২০২২। রামপুরহাট, বীরভূম।

বগটুই গ্রামে পঞ্চায়েত উপপ্রধানকে বোমা মেরে হত্যা করে কিছু দুর্বৃত্ত। তার কয়েক ঘন্টা কাটতে না কাটতে এই হত্যার পাল্টা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গ্রামে বোমাবাজির সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এক নাবালকসহ ৮ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। বেশিরভাগই মহিলা। এই ঘটনায় রাজ্যবাসী শিউরে উঠে। তড়িঘড়ি এডিজির নেতৃত্বে তিনজনের সিট গঠন করে সরকার। ক্লোজ করা হয় রামপুরহাটের আইসি ও এসডিপিওকে। ডিজি জানান এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৭২ ঘন্টার মধ্যে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। ২৪ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে যান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পাঁচ লাখ ও পরিবার প্রতি একটি চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কলকাতা হাইকোর্ট ২৫ মার্চ সিবিআইকে এই ঘটনার তদন্তের ভার দেয় এবং ৭ এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলে।

ঘটনা ৩। ৪ এপ্রিল, ২০২২। হাঁসখালি, নদীয়া।

এক ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়ের গণধর্ষণ। লোকাল পঞ্চায়েত সদস্যর ছেলের জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে নেশা খাইয়ে বন্ধুরা মিলে ধর্ষণ করে। জখম ও রক্তক্ষরণের কারণে মেয়েটি মারা যায়। পরিবার সূত্রে আরও অভিযোগ করা হয় জোর করে মেয়েটিকে দাহ করতে বাধ্য করে অভিযুক্ত ও তার সহযোগীগণ। ঘটনার কথা কাউকে বললে বা পুলিশে অভিযোগ করলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। ঘটনা চাউর হতেই রাজ্যবাসী হতবাক হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মূল অভিযুক্তসহ মোট ২ জনকে গ্রেফতার করে। তদন্তে পুলিশি খামতি উল্লেখ করে কলকাতা হাইকোর্ট ১২ এপ্রিল সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। এবং ২রা মের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলে।

প্রতিনিয়তই পশ্চিমবঙ্গজুড়ে এহেন খুন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। এর প্রধান কারণ ক্ষমতার আস্ফালন, পুলিশ তথা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা। বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে একদিকে তৈরি হয় ধনের পাহাড় আর অন্য দিকে আর্থিক শূন্যতা। ফলে শ্রমিক (যে শ্রম দেয়) শ্রম নিহিত মূল্য উৎপাদন করলেও তা তার হাতে আসে না। মজুরি নামক আংশিক মূল্যের আড়ালে শ্রমমূল্য চুরি হয়ে যায়। ফলে আবশ্যিক মূল্যের অভাবে ব্যক্তির মানবাধিকার (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন) অপূর্ণ থেকে যায়। ফলস্বরুপ ব্যক্তির বিকাশ ব্যহত হয়ে তৈরি হয় নানান বিকৃতি। ক্ষমতার লোভ, আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণের মত অপকাণ্ডে ভরিয়ে তোলে আর্থসমাজ।

যে আর্থসমাজে চলতে থাকে উদবৃত্ত মূল্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের রমরমা। যেহেতু সাংস্কৃতিক চর্চাহীন মানুষ রক্ষণকামিতায় ডুবে থাকে তাই আর্থসমাজে অপকাণ্ডকারী মানুষের সংখ্যায় বেশি। যে সংখ্যার ভারে আর্থসমাজের ভারসাম্য হারিয়ে কুক্ষিকরণী কাণ্ডে শ্রমক্ষেত্রের সংকোচন এবং বেকারত্বের সংক্রমণ ঘটে। মানবতার লাঞ্ছনা জর্জরিত সেই সমাজে হেন কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে বাকি থাকে না।

ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসু হয় তাহলে মন হয় স্বচ্ছ। যে স্বচ্ছতাতেই ধরা পড়ে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। আর যদি জিজ্ঞাসু না হয় তাহলে চেতনা রুদ্ধ হয়ে পড়ে, যে রুদ্ধতায় সমাজে অবাঞ্ছিত সেন্টিমেন্টের সংক্রমণ হয়। ফলে ভাল-মন্দের উপলব্ধির ক্ষমতা কমে যায়।

মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই চেতনার অতলতলী। তাই বিভিন্ন ক্রূর কার্যকলাপ এই রুদ্ধ চেতনায় থাকে। অনিয়ন্ত্রিত সেন্টিমেন্টগ্রস্ত ব্যক্তি নানান অবাঞ্ছিত সেন্টিমেন্টে ডুবে থাকে। ফলে দেহমনে তৈরি হয় ঘৃণা বিদ্বেষ। রক্ষণকামিতা খুব সহজেই এই ঘৃণা বিদ্বেষকে উসকে দেয়। দেহমনে থাকে অশান্তি, অস্থিরতা, হঠকারিতা। মন হয় অবচেতন, হিংস্র। অল্পতেই রেগে যায়। দেহে ক্ষরণ হতে থাকে এ্যাড্রিনালিন হরমোন। গা জ্বালা করে। উত্তেজিত অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে উপলব্ধির ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় চেতনার রুদ্ধতা নিকাশি কিছু ভাবতে পারে না। রুদ্ধতা কাটানোর জন্য কেউ মদ, বিড়ি, সিগারেটের নেশা করে, কেউ ড্রাগস নেয়, কেউ খুনোখুনি করে, কেউ নারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাহলে এই আর্থসমাজের প্রতিকার কীভাবে? বিষাক্ত দেহমনকে বিষমুক্ত করতে দরকার মানুষকে জিজ্ঞাসু করে তোলা, যুক্তি নির্ভর করে তোলা। তাতে চেতনা হয় উন্মুক্ত, মন হয় পরিষ্কার। তার জন্য দরকার সাংস্কৃতিক চর্চা, যে চর্চায় মানুষ তার নেতিবাচকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আত্মশক্তি বাড়বে। উপলব্ধির ক্ষমতাও বাড়বে। ব্যক্তি তার ভাল-মন্দের বিচার করতে পারবে সূক্ষ্মভাবে। সেইজন্য চাই বস্তুসম্মত শিক্ষা ও দীক্ষা। রক্ষণকামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী শুধুমাত্র ডিগ্রিধারী হয়ে ওঠে। যা তার কেরিয়ার গঠনে সহায়তা করে মাত্র। আর্থসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনো সদর্থক ভূমিকা থাকে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় একাডেমিক সিলেবাসে পারদর্শী হওয়াটা শিক্ষা নয়। বস্তুসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে জীবন অনুসন্ধানী। জগতের কোন বিষয়গুলো জীবনের উন্নয়নে সহায়ক আর কোনগুলো প্রতিবন্ধক বা ক্ষতিকর তা জানে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিক্ষা হলো বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলার কার্যক্রম, যা চেতনায় সমস্যার সংঘাতজনিত দ্বান্দ্বিক সমাধানের আপেক্ষিকতা। আর এই শিক্ষালব্ধ শক্তির প্রায়োগিক বিশ্বস্ততাই হলো দীক্ষা। যাতেই মানুষ উপলব্ধি করে সে কেমন আছে আর কেমন থাকতে চায়। যে দীক্ষা আর্থসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে মানবিক শক্তি। যে শক্তি বস্তুবিজ্ঞানের চর্চাতে সৃষ্টি করে শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে আর্থসমাজের রক্ষণকামিতা নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের কল্যাণের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানের টেকনোলজিকে ব্যবহার করে সম্পদ সৃষ্টি করে, শ্রমক্ষেত্র বৃদ্ধি হয়। যাতে শ্রমশক্তি শ্রমক্ষেত্র পায়। বস্তুসম্মত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রণয়ন ঘটে। যাতে শ্রমিকরা পায় আবশ্যিক মূল্য। মেধা পায় তার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র। আর্থসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে যায়, শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

---

৩ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

দুর্নীতি

রক্তশূন্য অবস্থায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নানান কায়দায় সরকারি আওতায় থাকা যৎসামান্য পাবলিক মানি অত্যন্ত সুচতুরভাবে অথবা স্থূলভাবে নয়ছয় করতে থাকে। এমতাবস্থায় আর্থসামাজিক গণমানস কী করবে না করবে তার কোনো দিশা না পেয়ে নেপথ্যের ক্ষমতাধর এবং তার দোসর অর্থাৎ মিডিয়া দ্বারা প্রচারিত ও নেপথ্য-নির্দেশিত রাস্তা ধরে হাটতে শুরু করে।

সেই চলার একটি ছেদবিন্দুতে অবশ্যই বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান তার ক্ষমতা হারায়। এসে যায় আরেক ভাগ্যান্বেষী। গণ জনতা সেই তিমিরেই! থিওরি অফ নেগেটিভ নেগেশন অফ নেগেশন!

এই ভবিতব্য? না হতে দিতে চাইলে, সচেতনভাবে আর্থ সমাজের পুনর্নির্মাণ চাইলে 'অস্তিত্ব' নির্দেশিত মহাভারত তত্ত্ব-নির্যাস পাণ্ডব প্রযুক্তি আর্থসমাজে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় তীর বিহীন ভেসে বেড়ানো! তীরে উঠাও হয় না, তীর্থ করাও হয় না!

শ্রীলংকার সংকট— মুক্তবাজারী স্বৈরাচারের সংকট

শ্রীলঙ্কা বেশ কিছুকাল জুড়ে আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে গেলেও তার গত কয়েক মাস যেন 'ডে অব জাজমেন্ট' সিচুয়েশন। অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। খাদ্য, জ্বালানি ওষুধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া শুধু নয়, অপ্রতুল। এক কেজি চালের দাম ২৯০-৩০০ টাকা, চিনিও সম পরিমাণ। ৪০০ গ্রাম পাউডার দুধের দাম ৪৯০ টাকা। এক কাপ চাও ১০০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে! গ্যাসের সিলিন্ডার ৪২০০ টাকা। দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট তীব্র থেকে তীব্রতম। ফরেন কারেন্সী রিজার্ভ মাত্র ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ বিদেশে যা ঋণ তাতে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মিনিমাম লাগে। ঋণ মেটাবার জন্য।

এদিকে দেশটি নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু আমদানি করে দিন চালায়। খাদ্যশস্য, চিনি, জ্বালানি, দুধ, ওষুধপত্র সবই আমদানি করতে হয়। কাজেই বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ভাণ্ডারে টান পড়া মানে কিছুই সে কিনতে পারছে না। সেই জন্য খাদ্য সংকট তীব্র হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি কেবল গত মাসেই (এপ্রিল, ২০২২) ছিল ২৫%।

অনাহারে অর্ধাহারে থাকা মানুষেরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলেন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বাদে।

আন্দোলন তীব্র হতে শুরু করলে শাসক দল আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করতে আন্দোলনকারীদের উপর গুন্ডা লেলিয়ে দেয়। একজন আন্দোলনকারী নিহত হলে পরিস্থিতি চরম রূপ নেয়। শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা আক্রান্ত হতে শুরু করেন। তাদের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে পদত্যাগ করেছেন। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনীর সহায়তায় গা ঢাকা দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা তবু বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের প্রধান স্লোগান গো গোতা গো অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি গোতাবায়ার পদত্যাগ।

তিনি কিন্তু তার পদ আঁকড়ে বসে রয়েছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে। ভারত চিন কিছু সহায়তা করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক আইএমএফ এর সাথে আলোচনা চলছে।

কিন্তু কেন এই অবস্থা হল দেশটির?

১। ট্যুরিজম অর্থনীতি

দেশটির অর্থনীতির মোট জিডিপির ১০-১২ শতাংশ ট্যুরিজমের উপর নির্ভরশীল। ২০১৮ সাল অব্দি এই ক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট আয় হত। ২০১৯ সালে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে ট্যুরিজম ধাক্কা খায়। কিন্তু ২০২০ এর মার্চ মাসে বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারি এই ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দেয়।

২। আয় ব্যায়ের ব্যালান্সহীনতায় বৈদেশিক ঋণ

ইনকাম ও এক্সপেন্ডিচারের ব্যালান্স না থাকলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন দেউলিয়া হয়ে যায় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বেশ কিছু কাল জুড়ে দেশটি একটি পরিবারের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তাদের যথেচ্ছার দেশটিকে এই পরিণতির দিকে নিয়ে এসেছে। আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হবার মূলে আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ উল্লেখযোগ্য। এই ঋণ কেবল চিনের কাছেই নয়, বিশ্বের ফিন্যান্স পুঁজির থেকে।

২০১০-২০ এর মধ্যে বিদেশি ঋণ দ্বিগুন হয়ে যায়। যেখানে ২০১৯ এ এই ঋণ ছিল জিডিপি এর ৪২%, ২০২১ এ তা দাঁড়ায় ১১৯% এ। ২০২২ এ দেশটির ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কেবল ঋণ শোধ করতে প্রয়োজন। অথচ হাতে বিদেশি মুদ্রা মাত্র (এপ্রিল ২০২২ এর হিসেবে) ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

'চিনের ঋণের ফাঁদে' এ দেশটির এই অবস্থা! ব্যাপারটি তেমন নয়। এপ্রিল ২০২১ এর হিসেবে মোট ঋণের ১০% চিনের কাছে। জাপান ১০%, ২২% বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ৪৭% আন্তর্জাতিক ক্যাপিট্যাল মার্কেট এর কাছে। (সূত্র: লোয়ি ইনস্টিটিউট, অস্ট্রেলিয়া)।

৩/ ট্যাক্স ছাড় ও যথেচ্ছ টাকা ছাপানো

বাজেট ঘাটতির অন্যতম কারণ ব্যাপক ট্যাক্স ছাড়। এতে ট্যাক্স প্রদানকারীর সংখ্যা ৩৩.৫% কমে যায়। ভ্যাট কমিয়ে ১৫% থেকে ৮% এ নামিয়ে আনা হয়। প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে এটিকে একটি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ট্রিট দেখার কথা বলেন। কিন্তু মহামারি বাড়া ভাতে ছাই দেয়।।প্রচুর পরিমান রেভেনিউ লস হল অথচ তা মার্কেটকে সচল করলো না। এমতাবস্থায় সরকারি খরচ সামলাতে যথেচ্ছ টাকা ছাপানো হল। আইএমএফ এর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে। যা হবার তাই হয়।

৪/ কৃষি সংকট: শক্ত শাসকের কেরামতি

এপ্রিল ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে দেশটির কৃষিকে ১০০% জৈব কৃষিতে রূপ দিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন। জৈব কৃষি

ভালো জিনিস। কিন্তু তা অর্জন করতে ধাপে ধাপে সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে হয়। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীদেরও অবাক করে দেয়। তারা প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে। কিন্তু শক্ত শাসক তা করবেন কেন? হি ইজ দ্য বস! ফলে যা হবার তাই হল। যে চা উৎপাদন শ্রীলঙ্কাকে বৈদেশিক মুদ্রা এনে দিত তা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এক্ষত্রেই শুধু ৪২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হল। ধান উৎপাদন ২০% কমে গেল। ইতিমধ্যে ধান উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জিত হয়েছিল ছমাসের মধ্যে তা উলটে গেল। ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ধান আমদানি করতে হল। চা ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনা ঘটল। কারণ জৈব পদ্ধতিতে এই চাষে আগের খরচের ১০ গুণ বেশি খরচ বেড়ে গেল। আর ফলন কমে হল অর্ধেক। তাহলে জিডিপির ১০% যে চা ক্ষেত্রের উপর নির্ভির করতো সেটিও গেল।

এক ভয়ানক কৃষি সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে (ব্যাপক গণবিক্ষোভ) নভেম্বর ২০২১ এ সরকার রাসায়নিকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ততদিনে যা হবার তা হয়ে গেছে।

৫/ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

ইতিমধ্যে ডুবতে বসা অর্থনীতি এই যুদ্ধ সিচুয়েশনে আরো তলিয়ে গেল। সিংহলি চা রপ্তানির সবচেয়ে বড় খাতক ছিল রাশিয়া। এবং শ্রীলঙ্কার ট্যুরিজম ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল এই দেশদুটির উপর। কারণ অধিকাংশ ট্যুরিস্ট ছিল এই দুই দেশ থেকে। এই যুদ্ধের পরিণামে চা ও ট্যুরিজম দুই ক্ষেত্রের মাধ্যমে আর্থিক পুনরুজ্জীবনের আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। শুধু তাই নয় যুদ্ধের ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ল, সূর্যমুখী তেলের দাম বাড়ল, গমের দাম বাড়ল।

৬/ অথরিটারিয়ান শাসক ও উগ্র জাতিয়তাবাদ

দেশটি একটি পরিবারের যেন ব্যবসা ক্ষেত্র। ২০১৮ সালে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা, ২০১৯ এর সন্ত্রাসী হানা, ইতিপূর্বে তামিলদের পরাজিত করে সিংহলি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ওড়ানো পরিস্থিতি পাকাচ্ছিল সেই জাতীয়তাবাদকে উগ্র ধর্ম -সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত রূপ দিতে। ২০১৮ থেকে পরপর মাইনোরিটিদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র সাপোর্টেড হানা অব্যাহত ছিল।

২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসে সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে নেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি। পরিবার তন্ত্র আরও একচ্ছত্র তন্ত্রে রূপ নেয়।

অথরিটারিয়ান এনার্কির ফলে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করাটাও ছিল কঠিন। তার উপর উগ্রজাতীয়তা ও ধর্ম সেন্টিমেন্টের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন! ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে নানান খামখেয়ালি কাণ্ডকারখানা প্রতিহত করা যায় নি।

পরিণাম আজকের দেউলিয়া দেশ, ক্ষুধা-দারিদ্র-রুটির হাহাকার আর অন্ধকারের সাম্রাজ্য!

শেষ পর্যন্ত তা কোথায় গিয়ে ঠেকে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ২২ মিলিয়ন মানুষ!

আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির সংক্রমণ যেমন দায়ী তেমনি দায়ী একটি পরিবারের গোটা দেশ নিয়ে দীর্ঘকালীন বেহ্নামি।

শিক্ষায় কর্পোরেট পুঁজি— প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

সামাজিক মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি নোটিশ এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। নোটিশের হেডিং, স্কুল শিক্ষায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল ২০২২ এর খসড়া নীতি ও তার গাইডলাইন। যার কোনো মেমো নম্বর এবং তারিখ নেই। নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কর্তৃক।

খসড়া নীতির মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১১ সালের পর থেকে স্কুল শিক্ষায় শিক্ষকদের স্যালারি, পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকারের বিশাল খরচ বেড়েছে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের গ্রস এনরোলমেন্ট ১১.৮ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬.৬ লক্ষ। সরকার ২৯০০ স্কুলকে আপগ্রেড করেছে। প্রতিবছর সেকেণ্ডারি ও হায়ার সেকেণ্ডারি স্তরে যথাক্রমে ৯.৫ লক্ষ ও ১২ লক্ষ পাশ করছে। তাদেরকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানে সরকারের খরচ বেড়ে চলেছে। অতএব সরকার পাবলিক ও প্রাইভেট এই দুই এর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে চাইছে। তার জন্যই তারা শিক্ষাক্ষেত্রে পিপিপি মডেল নিয়ে আসছে। বিশেষত স্কুলের পড়ে থাকা পরিকাঠামো ও অব্যবহৃত জমিকে প্রাইভেট পুঁজির হাতে তুলে দিতে চায়।

সরকারের প্রত্যাশা প্রাইভেট পুঁজি সরকারি সম্পত্তির ব্যবহারে শিক্ষার প্রসার ঘটাবে। প্রাইভেট পুঁজি মূলত সরকারের জমি অথবা বিল্ডিং এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাতে পারবে।

খসড়া-নীতি ঘোষিত উদ্দেশ্য

খসড়া নীতি ও গাইডলাইনে কিছু উদ্দেশ্যের অবতারণা করা হয়েছে—

ক) ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি করা।

খ) ছাত্রদের বৌদ্ধিক দক্ষতা বাড়ানো।

গ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধি।

ঘ) জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তার বিনিময় ও প্রয়োগ ঘটানো।

ঙ) স্কুল ক্যাম্পাসের সম্প্রসারণ ঘটানো।

চ) অনলাইনে শিখন-শিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থাপনা গড়া।

ছ) আন্তঃরাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষা কর্মসূচিগুলির সমন্বয় ও আদান-প্রদান ঘটানো।

জ) ধারাবাহিক শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঝ) শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য খেলাধূলা, পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত এবং সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী গ্রহণ করা। যেমন - এনসিসি, এনএসএস প্রভৃতি।

ঞ) আন্তঃরাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অলিম্পিক, সেমিনার, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ক্রীড়া প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের যোগদানের বন্দোবস্ত করা।

ট) ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষ করে তোলা। এর জন্য বৃত্তিমূলক কোর্স, দক্ষতামুখীন কোর্সের অন্তর্ভুক্তি।

খসড়া নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি

ক) এই নীতিতে সরকার সময়ের সাথে রিকুয়েস্ট ফর প্রপোজাল প্রকাশ করে প্রাইভেট পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাবে স্কুলে পিপিপি মডেল গ্রহণ করার জন্য।

খ) কোন পুঁজিগোষ্ঠীকে এই মডেলের দায়িত্ব দেবে তার জন্য সরকার টেন্ডারের ব্যবস্থা করবে।

গ) প্রাইভেট পার্টনারের গুণমান ও খরচ-ক্ষমতা বা বিনিয়োগ করা পুঁজির পরিমাণের মূল্যায়ন করবে সরকার। কারিগরি ও আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা করা হবে।

ঘ) যে প্রাইভেট পার্টনার শিক্ষার দায়িত্ব পাবে, তারা শিক্ষার মাধ্যম ও এফিলিয়েটেড বডি গঠন করবে। তারজন্য সরকার তাদেরকে যথাযথ সহযোগিতা করবে।

ঙ) সরকার একটি সুপারভাইজ কমিটি গঠন করবে, যারা এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির দেখভালের দায়িত্বে থাকবে। কমিটিতে থাকবে রাজ্য প্রজেক্ট ডিরেক্টর, সমগ্র শিক্ষা অভিযান, কমিশনার অব স্কুল শিক্ষা দপ্তর, ফিনান্স বিভাগ, আইন বিভাগ এবং সরকার মনোনীত আরও অন্যান্য অফিসার।

চ) খসড়া নীতি অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্রাইভেট পুঁজির ভূমিকা

ক) রাজ্য সরকারের রুলস, রেগুলেশন এবং এফিলেটেড বডির নিয়ম মেনে চলবে।

খ) সরকারের নীতির সাথে তাদের নীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে চলবে।

গ) প্রাইভেট পুঁজির বিনিয়োগকারীরা পরিকাঠামো, বিল্ডিং যাবতীয় কিছুর পরিচালনার জন্য যথার্থভাবে পুঁজির নিবেশ ঘটাবে। যাতে করে সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালিত হয়।

ঘ) স্কুল পরিচালনার জন্য যাবতীয় রেকারিং ও নন-রেকারিং খরচ তারা বহন করবে।

ঙ) গুণমানগত শিক্ষা ও সুন্দর-সচলতার সাথে স্কুল শিক্ষার পরিচালনার প্রয়োজনে তারা গুণমান সম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে পারবে।

চ) প্রাইভেট পার্টনাররা স্কুল পরিকাঠামোতে কেবলমাত্র একাডেমিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। অন্য কোনো কর্মসূচি তারা নিতে পারবেনা।

ছ) পরিকাঠামোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব থাকবে প্রাইভেট পার্টনারের।

জ) তারা স্কুলে কিংবা তার বাইরে নিয়মিত ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এর জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা রাখবে।

স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকুরি সংক্রান্ত শর্তাবলী

ক) স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগে একটা ট্রান্সপারেন্ট প্রক্রিয়া থাকবে।

খ)শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন রাখা হবে। স্কুল কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে।

গ) রুলস ও শর্তাদি যাবতীয় ঠিক করবে প্রাইভেট পার্টনার সরকারে রেগুলেটারি কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

স্কুলের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারে ভূমিকা

স্কুলের কার্যক্রমের সার্বিক দায়িত্বে রাজ্য সরকারের পক্ষে একটা রেগুলেটারি কমিটি থাকবে, যারা স্কুল কার্যক্রমের পর্যালোচনা করতে পারবে। তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী যাবতীয় রাজ্য সরকার নির্ধারণ করে দেবে। তবে মূল ভূমিকা হবে, স্কুলের কাজে যেন সরকারকে খুব কম ভূমিকা নিতে হয়। বেশির ভাগটাই প্রাইভেট পার্টনার করবে।

সরকার পক্ষীয়দের মতামত

বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই ধরনের নোটিশ প্রকাশের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন এগুলি বিরোধীদের অপপ্রচার। তবে বর্তমান পরিবহন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, মমতা ব্যানার্জীর সরকার শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও গুণমান সম্পর্কিত শিক্ষার জন্য প্রাইভেট শিক্ষা সংস্থাগুলিকে জায়গা করে দিতে চায়।

খসড়া নীতির বিরোধিতা

এই খসড়া নীতি প্রকাশ হওয়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। ব্রাত্য বসুর বক্তব্যের আগেই এসএফআই ও ডিআইএফওয়াই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। এই বছরের মার্চ মাসে সিপিআইএম নবান্ন অভিযানে এর বিরোধিতা করে।

এই নীতির বিপক্ষে সমালোচকদের বক্তব্য, এই নীতি বর্তমান অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক কম্পালসরি শিক্ষার অধিকার আইনকে ধ্বংস করে দেবে। গরিব ও আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণির ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষা শিক্ষাঙ্গন থেকে ছিটকে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক তপনকুমার রায় বলেন, 'প্রাইভেট পুঁজি যতটা বিনিয়োগ হবে, তার থেকে কয়েকগুণ বেশি মুনাফা তারা তুলে নিবে। তাই এই নীতি ফ্রি বা সস্তা হবেনা। সরকার হয়তো গরিবদের জন্য কিছু সংরক্ষণ করবে। কিন্তু যেখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্কুল আসত কেবলমাত্র ফ্রি শিক্ষা ও ফ্রি খাবারের জন্য। তারা কি আর আসবে?' অল বেঙ্গল শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন বলেন, ১০ টি সরকারি স্কুলের মধ্যে ৯ টির শিক্ষার্থীই দরিদ্র ফ্যামিলি থেকে আসে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রে প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষকের আর্থিক চাপ রয়েছে বলে সরকার উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু পাইন বলেন যে, শিক্ষা বাজেটের সময় এই সকল ফ্যাক্টরগুলির দ্বারাই তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ২০২১-২০২২ সালে, বাংলার শিক্ষার বাজেটে ৪১০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা স্বাস্থ্য খাতের তুলনায় প্রায় ২.৫ গুণ বেশি এবং গ্রামীণ উন্নয়নখাতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মহামারির কারণে ২০২১-২২ সালে রাজস্ব ঘাটতি নির্ধারণ করা হয় ২৬৭৫৫ কোটি টাকা (জিডিপির ১.৭৭ শতাংশ)।

কিন্তু শিক্ষাবিদরা যুক্তি দেখান যে, সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের জন্য আর্থিক কারণের কথা বলেছে তা ঠিক নয়। কারণ, সরকার গত ৫-৬ বছরে স্কুলে প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষক ও অন্যান্য পদ পূরণ করেনি। তারা কম ভাতাতে চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষকদের কাজ করাতে চাইছেন— পাইন বলেন।

সরকার এই ড্রাফট পলিসির কথা স্বীকার করুক বা না করুক, তারা স্বীকার করেছে যে কোয়ালিটি এডুকেশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। অতএব একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে গুণমানগত শিক্ষার অভাব রয়েছে। এর জন্য দায়ী কে বা কারা? সরকার কী তাদের দায় এড়াতে কর্পোরেট পুঁজিকে নিয়ে আসছে?

নিয়োগ ও সরকারের দায়-দায়িত্ব

বিগত ৬-৭ বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে নিয়োগ হয়নি। তার আগে সর্বশেষ যে নিয়োগ প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তরে হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে অনেক দুর্নীতি ঘটেছে। তার প্রভাব পড়েছে স্কুল শিক্ষায়।

ক) প্রাইমারি স্তর

২০১৪ সালের প্রাইমারি টেট পরীক্ষা ২০১৫ তে গ্রহণ করা হয়। তা থেকে আরো দু-বছর বাদে ২০১৭ সালে বেশ কিছু প্রার্থী নিয়োগ পান। সেই নিয়োগের উপর হাইকোর্টে প্রচুর

মামলা রয়েছে। তার যথাযথ উত্তর প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি। সরকার পক্ষ তা বার বার এড়িয়ে গেছে। তা ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী বিগত বিধানসভার আগে সেই টেট থেকে প্রায় ১০ হাজার মত সেই বছরের পাশ করা প্রার্থীদের চাকুরি দেন। বাকিদের পরে দেবেন বলেন। এই নিয়োগে প্রচুর অযোগ্য প্রার্থী ঢুকেছে বলে অনেকেই দাবি করেন। উৎকোচ দিয়ে কিংবা বিভিন্ন সংরক্ষণের মাধ্যমে। এই ঘটনা যে আগের সরকারের আমলে ঘটেনি তা নয়। তারা সূচনা করেছিল। বর্তমান শাসকের শাসনে তা উলঙ্গভাবে বেরিয়ে আসছে। এই সব শিক্ষকদের প্রভাবে স্কুলগুলিও ভোগান্তিতে ভুগছে। কোয়ালিটি এডুকেশন দূরের কথা, শিক্ষকদের নিয়মিত স্কুলে আসা যাওয়ার ঠিক নেই। আর পড়াশোনা তারা কি করাবে তা তাদের স্কুলে হাজিরার নমুনা থেকেই বোঝা যায়। এদের তত্ত্বাবধান করার জন্য যে সকল আধিকারিক রয়েছে, তারা কোন কানাগলি থেকে টাকা পাওয়া যাবে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। স্কুল পরিদর্শন করে না।

খ) আপার প্রাইমারি স্তর

২০১৪ সালে আপার প্রাইমারির বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে টেট পরীক্ষা হয়। দীর্ঘকাল বাদে তার মেরিট লিস্ট প্রকাশ পায়। সেই লিস্টের বিপক্ষে আদালতে মামলা হয়। আদালত মেরিট লিস্ট বাতিল করে পুনরায় মেরিট লিস্ট প্রকাশের জন্য নির্দেশ দেয় কমিশনকে। বর্তমানে কমিশন মেরিট লিস্ট প্রকাশ করেছে। সেই লিস্টের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। কমিশন আনুমানিক ১০ হাজার জনের ডকুমেন্ট দেখেছে। সেই লিস্টের বিরুদ্ধেও আদালতে মামলা হয়েছে। মামলাকারীদের দাবি এই তালিকার মধ্যেও দুর্নীতি হয়েছে। অনেকের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আদালত বাকিদের অভিযোগ নিতে বলেছে এবং দ্রুত তার মীমাংসা করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। কমিশন অভিযোগ নিলেও কিন্তু এখনো নিয়োগ দিতে পারেনি।

গ) মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর

নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তিই শেষ। সেই নিয়োগ হয়েছে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। সেখানেও প্রচুর দুর্নীতি ও অযোগ্য পাশ না করা প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে নবম-দশমের ওয়েটিংলিস্টে থাকা প্রার্থীরা দীর্ঘকাল জুড়ে আন্দোলন করছে। তাদের অভিযোগ স্কুল সার্ভিস কমিশনের তালিকার অনেক পরে থাকা প্রার্থীরা চাকুরি পেয়েছে, তারা পায়নি। বর্তমানে এই নিয়োগের উপর হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই এর তদন্ত চলছে।

নিয়োগ ক্ষেত্রের এই হাল থেকেও এটি পরিষ্কার যে সরকার দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। কর্পোরেট ফিনান্স পুঁজির নিজের বিনিয়োগক্ষেত্র খোঁজা হন্যে অবস্থাকে তাই সরকার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রাইভেট পুঁজির কাছে শিক্ষার দায়ভার সে বিক্রি করে দিচ্ছে তাই।

শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব

বিশেষত প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। রাজ্যের বেশিরভাগই স্কুলে শিক্ষক অনুপাতে ছাত্রদের সংখ্যা নেই। অনেক শিক্ষক উদবৃত্ত রয়েছে। অথচ খাতা কলমে দেখা যাচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রী। কিন্তু তারা কেন আসেনা, কোথায় যায়, কিংবা শিক্ষকরা কেন তাদের ধরে রাখতে পারছেনা কোনো কিছুই তারা ভাবে না। প্রত্যেক শিক্ষকের নিজস্ব যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা যথাবিহিতভাবে পালন করলেই শিক্ষার্থীদের অন্য কোথাও যেতে হয়না। বেশিরভাই স্কুলে শিক্ষার্থীর নাম থাকে কিন্তু তারা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে পড়তে যায়। কেননা অভিভাবকরা দেখে নিয়েছেন শিক্ষকরা এখানে পড়ান না। শ্রমে ফাঁকি দেন। শ্রমচুরি করেন।

পরিণামে আজকে সরকারও শিক্ষাঙ্গনে প্রাইভেট পুঁজির প্রবেশ চাইছে। তা ভালো হবে না মন্দ হবে সেটা তো সরকারের এজেণ্ডা থেকেই অনুমান করা যায়। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যদি কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্যই হয়, তবে তা আদায় করতে হবে? আর যদি কেবলমাত্র দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা হয় তবে তো কথায় নেই। কর্পোরেট সেক্টরে অলরেডি যারা চাকুরি করেন, তাদের প্রতি নজর দিলেই দেখা যাবে কেমন করে তাদের ছিবড়ে করে ১০-১২ ঘন্টা করে কাজ করতে হয়।

শিক্ষার মান তাতে কেমন হবে? কর্পোরেটি মানসিকতার প্রবেশ শিক্ষাতে ঘটলে তার মানও কাটখোট্টা হবে। এক একটা মানুষরূপী যন্ত্র শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসবে।

অতএব যে আর্থসমাজে সকল মানুষের খাদ্য জোটে না এখনও তারা এই কর্পোরেট শিক্ষার ধারে কাছে যেতে পারবেনা। ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামোর জন্য অর্থের যোগান আর্থসমাজের মানুষের কাছ থেকেই তারা শুষে নেবে।

করণীয় কী?

শিক্ষাঙ্গনে যারা যুক্ত আছেন, তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। কেননা প্রাথমিক কোপ তাদের উপরই প্রত্যক্ষভাবে আসবে। নিজ নিজ দায়িত্বটুকু যথাসাধ্য পালন করা। অভিভাবকদের সাথে মিটিং করা। বর্তমানের টেকনোলজির যুগকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট সংস্থার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে -

পরবর্তী অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

আর্থসামাজিক অন্ধকার মোচনের শিক্ষা ও দীক্ষা

শ্রীচেতনিক

১/ অন্ধকার

অন্ধকারের পরিচিতি কীসে ঘটে?
- দেশে বেকারত্ব আছে কি?
- দেশে ভিক্ষাবৃত্তি/ উঞ্ছবৃত্তি আছে কি?
- দেশে যৌনবৃত্তি/ বেশ্যাবৃত্তি আছে কি?

ক) তিনটি প্রশ্নের উত্তর বাচক রেসপন্স কী?
বিগত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব। উদবৃত্ত শ্রম। প্রাইভেট পুঁজিও বিনিয়োজিত হচ্ছে না। নতুন শ্রমক্ষেত্র নেই। এগজিস্টিং শ্রমশক্তির উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ছে।

খ) গত কয়েক বছরে কর্পোরেট পুঁজির কেন্দ্রীভবন আরো ঘটেছে। তথ্য বলছে সিংহ ভাগ উৎপাদিত সম্পদ কয়েকটি ফ্যামিলির হাতে। কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে হুহু করে। শ্রমনির্ভর মানুষের দাসত্ব ততই প্রগাঢ় হয়ে উঠছে।

গ) ভিক্ষাবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তি সেই অনুপাতে বাড়ছে। জনতার নাগরিক চরিত্র গড়ে উঠতে না দিতে সজ্ঞানে ডোল পলিটিক্স এর রমরমা ঘটানো হচ্ছে। এর পিছনে ছোটার মাধ্যমে অধিকার, অধিকার বোধ বা অধিকার অর্জন বলে আর কিছু থাকে না। পরিণামে কর্পোরেটি নেপথ্য উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে জনতার নাগরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক হিসেবে তা কাজ করে।

ঘ) সামূহিক যৌনবৃত্তির আবহ দেশব্যাপী নয়, বিশ্বব্যাপী। ইন্টারনেট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, সিনেমা, সিরিয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে যৌনবৃত্তি সংক্রমণ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরাও যৌনবৃত্তিতে এসে যাচ্ছে। লক্ষ্য জড়ভোগের সামগ্রী!

যে রক্ষণকামী অপশক্তি যৌনবৃত্তির ইন্ধন দেয় সেই একই শক্তি যৌনবৃত্তিকে শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ারও দাবি জানায়। একই সাথে নারীবাদের সংক্রমণের মাধ্যমে রক্ষের এজেণ্ডা ফুলফিল করতে থাকে।

ঙ) উপরোক্ত বড় বড় সিম্পটম গুলি ছাড়া আর কী হয়?... আর্থসমাজ সংস্কৃতি বন্ধ্যা হয়। পরিণামে প্রকৃতির উপর অত্যাচার তীব্রতর হয়। জলবায়ু বিষিয়ে যায়। যাচ্ছে নাকি?...

সামূহিক এম্পায়ার অব গ্রিড মানবতাকে নানান দিক থেকে দলিত, মথিত করতে থাকে।

অতঃপর আর্থসমাজ অন্ধকারের আবর্তে নিমজ্জিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
কেন এই অন্ধকার?

২/ অন্ধকারের নেপথ্য

কেন প্রসঙ্গেই জানা দরকার এই অন্ধকারের জন্য দায়ী কী বা কে?

এর জন্য দায়ী মানব সত্তার না বাচক আত্মকেন্দ্রিক রক্ষণবৃত্তি। যা সেই সত্তারই আত্মবিকেন্দ্রিক বিকাশবৃত্তিকে ডমিনেট করেই নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তার জোরের জায়গাটা হল সে জন্মসূত্র থেকেই সেই বলবত্তার অধিকারী! সেই রক্ষণবৃত্তি কী রক্ষা করতে চায়? রক্ষা করতে চায় তার মানস পুঁজি সংক্রামিত পুঁজি মানসের আঁতুড় ঘর। সেই অনধিকার দখলদারিত্ব থেকেই অর্থনীতির কালারূপ অর্থাৎ কুক্ষি অর্থনীতির ইন্ধনী। এই কুক্ষি অর্থনীতির যুগ-প্রেক্ষিতগত নাম আলাদা আলাদা হলেও তার সারবত্তা একই। কখনো তা সামন্ত অর্থনীতি, কখনো বা পুঁজি অর্থনীতি কখনো বা পুঁজি অর্থনীতির ভিন্ন রূপ কর্পোরেট অর্থনীতি নামাঙ্কিত।

এই অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল মুক্তবাজার। যার উপর কারুর নিয়ন্ত্রণ নেই। আসলে কি তাই? না, নিয়ন্ত্রণ আছে, তা কর্পোরেট পুঁজির বা অন্যভাষায় কুক্ষি অর্থনীতির তাঁবেদার রক্ষের।

এই অর্থনীতিতে আবশ্যিক সহ উদবৃত্ত রক্ষণকামিতা কুক্ষি করে নেয়। শ্রমিক তথা উৎপাদক তার উদবৃত্ত দূরস্থান আবশ্যিকেরও হিসেব পায় না।

অতঃপর, উদবৃত্ত মূল্যরূপী আর্থসামাজিক সম্পদ ধন রূপে শক্তিশালী ব্যক্তিদের পকেটে পকেটে ঢুকে যায়। আর্থসমাজে একদিকে অশ্লীল বিলাস আর অন্যদিকে দারিদ্র্যের নোংরা সংক্রামিত হয়ে যায়।

দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত অত্যাচারিত মানুষেরা যাতে বিক্ষোভ বিদ্রোহ না করে সেটি নিশ্চিত করা দরকার! তা কীভাবে করা যায়?

করা যায় শিক্ষা বিভাগকে কব্জা করে। পাঠক্রম নির্বাচন থেকে শুরু করে শিক্ষা বিভাগীয় যাবতীয় বিষয়কে রক্ষণকামী খপ্পরে বিকৃত করে দেওয়া হয়।

তারপরেও একাডেমিক সেই অঙ্গনে কিছু থাকে। হাঁ, থাকে। থাকে ক্যারিয়ারিস্ট তৈরি করবার মালমশলা। এই

ক্যারিয়ারিস্ট মালমশলা থাকলেই বেশ আর কী! প্রশ্ন করবার কোনো ঝক্কি নেই।
র‍্যাশনালিটি অর্জনের কোনো দরকার নেই। অ্যানিমাল বনে থাকাটাই তখন ভবিতব্য!
র‍্যাশনালিটি অর্থাৎ মানবতা তখন অ্যানিম্যালিটি অর্থাৎ দানবতার পায়ের তলায় খাবি খায়। রক্ষ এটাই চায়।

৩/ মানবতার অর্থনীতি

কিন্তু মানবতার অর্থনীতি কী? হ্যাঁ, তা হল, পরিকল্পিত অর্থনীতি। যাতে আর্থসামাজিক সম্পদ ব্যক্তি কুক্ষিতে ঢুকতে পারে না। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মসূচিসমূহ নেতিবাচক ভূমিকায় না গিয়ে আর্থসমাজের বস্তুভিত্তিক বিকাশে সহায়তা করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অন্য মাত্রা পায়। তাই এই অর্থনীতি প্রণয়ন করতে গেলেই শিক্ষার প্রশ্নটি এসে যায়। কারণ তা এমনি এমনি করা যায় না। তার জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মার্কসীয় তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য Theory of Negation of Negation। অর্থাৎ নেতির নেতিকরণ। কী এটি?
মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশিষ্ট জীবন ব্যবস্থা হল একটি নেতিবাচক ব্যাপার। কারণ তা মানবতার বিপরীত ব্যবস্থাপনা। তাতে শোষণ ও চৌর্যকে আইনি রূপ দিয়ে দিনে ডাকাতির ব্যবস্থা করা হয়। পরিণামে আর্থসামাজিক উদবৃত্ত মূল্য কর্পোরেট বৃহৎ পুঁজির খপ্পরে চলে যায়। তাই এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার যাবতীয় তন্ত্র নিজেই 'না'। এটিই প্রথম না। এই 'না'- কে নেগেট করেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় 'হ্যাঁ' অর্থাৎ ইতিবাচকতা বা পজিটিভিটি বা মানবতা। যা তখন প্রণয়ন করে পরিকল্পিত অর্থনীতি। যার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত জারকে পরাজিত করে সোভিয়েত বিপ্লব।
এই নেতির নেতিকরণ আর্থসামাজিক প্রেক্ষায় অত সরল অবস্থায় নেই। যেমন ইন্দিরা স্বৈরাচার দেশে চরম অবস্থা নামিয়ে আনলে তার নেতিকরণে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা কি বস্তুবাচক জীবনগামী পথ নির্মাণ করেছিল? না করেনি। কিন্তু সে নিজেই আর একটি 'না'-বাচক রেজিম হিসেবে পরিগণিত ছিল। তাহলে একে কী বলা হবে? 'অস্তিত্ব' নেতির নেতিকরণ সূত্রে এক্সটেনশন করেছেন। ১) থিয়োরি অব পজিটিভ নেগেশন অব নেগেশন। ২) থিয়োরি অব নেগেটিভ নেগেশন অব নেগেশন। সোভিয়েত বিপ্লব থিয়োরি অব পজিটিভ নেগেশন অব নেগেশনের দৃষ্টান্ত। ইন্দিরার স্বৈরাচারকে উৎখাত করে না বাচক পরবর্তী জমানার ক্ষমতা দখল থিয়োরি অব নেগেটিভ নেগেশন অব নেগেশনের দৃষ্টান্ত। মানবতা প্রতিষ্ঠায় এই নেতির নেতিকরণ আর্থসমাজের পুনর্গঠনবাচক বস্তুবাদী শিক্ষা ছাড়া সম্ভব?

৪/ নেতিবাচকতায় শিক্ষা-দীক্ষা অর্থহীন

নেতির না বাচক নেতিককরণের (Theory of Negative Negation of Negation) জন্য শিক্ষা ও দীক্ষার দরকার হয় না। কারণ, তা মানব সত্তার না-বাচক নাস্তিরই ইন্ধন। অর্থাৎ তা প্রবৃত্তির ইন্ধন বাচক। প্রবৃত্তিকে চেতনার নিয়ন্ত্রণ বাচক নেতির হ্যাঁ বাচক নেতিকরণের (Theory of Positive Negation of Negation) জন্য শিক্ষা-দীক্ষা সহ এক বিস্তারিত আর্থসামাজিক প্রশ্নমালা ও তার উত্তর বাচক আর্থসামাজিক কর্মসূচি থাকতে হয়।

৫/ বস্তুবাচক শিক্ষা ও দীক্ষা

'শিক্ষা চেতনা বাড়ায়, চেতনা ঘটায় বিপ্লব' বহুল প্রচলিত এই কথাটি রক্ষের মুখের কাচমিষ্টি কথা। তথাকথিত মার্কসীয় ঘরানায় এর চলাচল আবার অনেক বেশি। না, শিক্ষা চেতনা বাড়ায় না। তাহলে তো চেতনা বেড়ে বিপ্লব উপচে পড়ত!
'দ্বান্দ্বিক সত্তা চেতনার অর্গল খুলতে পারলেই জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ শিক্ষা অর্জন করতে পারে'... (অস্তিত্ব)।
ব্যাপারটি কেমন?
জানা দরকার শিক্ষা দুই ধরনের হতে পারে। ১.. জীবনের বিকাশ বাচক শিক্ষা। ২... রক্ষণকামী শিক্ষা।
ইতিপূর্বেই উল্লেখিত যে অর্থনীতির কালারূপ যাদের সাম্রাজ্য গড়ে দেয় তারা শিক্ষাকে কিছুতেই জীবন বিকাশী হতে দিতে চায় না। কারণ তাতে তাদের সাম্রাজ্য টেকে না। তাই তারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষাঙ্গনে একাডেমিক ক্যারিয়ারিস্ট গড়ার আবহ খাড়া করে। সেই মতই সিলেবাস প্রণয়ন করে। অথচ উদ্ধৃতাংশে উল্লেখিত বিষয়বস্তু কী বলে? না, জীবন বিকাশী অর্থাৎ আবহনী শিক্ষা অর্জন করতে গেলে সত্তার দ্বন্দ্ব জাগিয়ে সেই সত্তা থেকে আমিত্ব-চেতনাকে বের করে আনতে জ্ঞানের সন্ধান করতে হয়। তাতেই নিজ দেহমনকে আলোকিত করার বিদ্যা ও বুদ্ধি তথা অন্ধকারকে আয়ত্ব করবার অভিযোজনী শক্তিবাচক শিক্ষা অর্জিত হয়।
তাহলে শিক্ষার সংজ্ঞা যা পাওয়া গেল তাতে কি একথা চলে আসছে না যে, একাডমিক শিক্ষার গুরুত্ব নেই? না, আসছে না। একাডেমিক শিক্ষাঙ্গন রক্ষণকামের কেরানি সাপ্লায়ার তা বহু আগেই ব্রিটিশ রক্ষ স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু সেই শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষা নেওয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রাজা রামমোহন রায়-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-নেতাজী-আম্বেদকর প্রমুখরা নিজ সত্তার কারা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন। আর্থসমাজ পেয়েছিল তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রের নেতৃত্ব। একাডেমিক শিক্ষাঙ্গন রক্ষণবাচক রক্ষী হয়েও কিছুই করতে পারে নি।

বিশ্বাঙ্গনে দেখি কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ-মাও সে তুং-হোচিমিন-আনোয়ার হোজা-ফিদেল কাস্ত্রো প্রমুখ ট্যালেন্টদের। যারা প্রত্যেকেই রক্ষণকামী একাডেমিক শিক্ষাঙ্গন থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন।

তাই একথা খুব সহজ করে সহজেই বলা যায় যে, একাডেমিক শিক্ষাঙ্গন যেমন চেতনা বাড়ায় না, কিন্তু চেতনা রুদ্ধ করার হাজার হাজার অপকৌশল করলেও চেতনা রুদ্ধ করতে পারে না। শক্তিমান সত্তা ঠিকই আমিত্ব চেতনাকে সত্তা থেকে নিস্ক্রান্ত করে।

তখনই শুরু হয় সৃষ্টি যজ্ঞ।

৬/ অর্গল ভাঙার প্রযুক্তি

অতঃপর সত্তার অর্গল ভাঙার প্রযুক্তি!

সেটি কী?

সেটিই হল জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম। তা হল জন্মাষ্টমী প্রযুক্তি অর্থাৎ মহাভারত প্রযুক্তি।

এই প্রযুক্তির প্রয়োগে ব্যক্তি তার দেহমন তথা আর্থসমাজের পরিচিতি নেয়। আইডেন্টিফাই করে বিকাশের বাধা। আর তারপর বাধা উৎসাদনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়।

অর্জিত জ্ঞানালোকের প্রায়োগিক প্রজ্ঞা অর্থাৎ দীক্ষায় সেই কর্মযজ্ঞ আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা কার্যকর করতে থাকে।

এই জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম প্রযুক্তিতে ব্যক্তি আর্থসামাজিক শ্রমে অংশ গ্রহণ- মূল্য বিভাজন-আবশ্যিক বুঝে নেওয়া-উদবৃত্ত আর্থসমাজকে বুঝিয়ে দেবার প্রক্রিয়াতেই জ্ঞানান্বেষী অন্ধকারভেদী শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

কিন্তু কুক্ষি বা মুক্তবাজার অর্থনীতির খপ্পরে তা কী করে সম্ভব?

সম্ভব। রক্ত করবীর রাজার সংক্রামিত জালের থেকে রাজা সহ গোটা প্রজারা কি বেরিয়ে আসেনা? মুক্তধারা নাটকেও কি সেই অচলায়তন ভাঙার গান গাওয়া হয়না? অচলায়তনে বন্দি অমলের মনকে কি রক্ষণকামিতা আটকে রাখতে পারে?

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, জারের সংক্রামিত অচলায়তনের মধ্যেই স্টাডি সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছিল। তারই ক্রমানুশীলন মার্কসবাদকে আর্থসামাজিক বিকাশবাচক বিপ্লব ঘটানোর অনন্য ইডিওলজি হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিল। মানবজাতি পেয়েছিল বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ **১৯১৭** এর নভেম্বর বিপ্লব।

---

২২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

শিক্ষায় কর্পোরেট পুঁজি— প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

রাখার জন্য নতুন নতুন চিন্তাভাবনা। সেই অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা। শিক্ষার পথে যে সকল বাধা-বিপত্তি আছে তা আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করা। সমাধানের উপায় বের করা। সচেতন নাগরিকদেরও দায়িত্ব হল স্কুলগুলিকে সচল রাখা। না হলে আর্থসমাজের সকলকেই কর্পোরেটি জালে আটকা পড়তে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

1. সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ‘খসড়া নীতি’।
2. Hindustan Times, Published on Feb 17, 2022.
3. The Indian EXPRESS, dated 18 Feb, 2022.
4. India Today, On 21 Feb, 2022.

রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের ১০০ দিন

কিংশুক সন্ন্যাসী

রাশিয়া এই বছরের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে। এই আক্রমণকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক তরফা আগ্রাসন হিসেবে মনে করে। এই আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। প্রায় ৬.৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দেশ ছেড়ে প্রতিবেশি পোল্যাণ্ড , রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, বেলারুশ, রাশিয়াতে আশ্রয় নিয়েছে। বেশির ভাগই নারী ও শিশু। বাকিরা দেশে থেকে লড়াই করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনিস্কি ১৮ থেকে ৬০ বছরের সকল নাগরিককে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার আবেদন করেছেন।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণকে পুতিন কখনোই যুদ্ধ বা হামলা বলে মানতে চাননি। তিনি বলেন, এটি হল, 'স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন' বা বিশেষ সামরিক অভিযান। পুতিন রাশিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, তার উদ্দেশ্য হল, 'ইউক্রেনের নিরস্ত্রীকরণ ও নাৎসি মুক্ত করা'। আট বছর ধরে ইউক্রেন সরকারের 'নির্যাতন ও গণহত্যা' থেকে জনগণকে মুক্ত করা।

কিছুদিন আগে রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান সের্গেই নারাস্কিন বলেছেন, 'রাশিয়ার ভবিষ্যৎ এবং বিশ্বে রাশিয়ার অবস্থান এখন ঝুঁকিতে পড়েছে।'

বোমাবর্ষণ এখনো চলছে। তবে সর্বশেষ শান্তি আলোচনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, রাশিয়া আর ইউক্রেনের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আগ্রহী নয়। ইউক্রেনকে নিরপেক্ষ একটি দেশ হিসাবে দেখতে ইচ্ছুক।

১।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়। ইউক্রেন স্বাধীনতা পায়। দেশটি ক্রমেই পশ্চিমা দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নেটোর। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেটির পরিবর্তন চান। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে তিনি 'ঐতিহাসিক রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতা' বলে মনে করেন। তিনি দাবি করেন, রাশিয়া আর ইউক্রেনের মানুষ 'এক জাতি'। তিনি ইউক্রেনের ইতিহাস অস্বীকার করে জোর দিয়ে বলেছেন, 'ইউক্রেন কখনোই প্রকৃত রাষ্ট্র ছিল না।'

২০১৩ সালে রাশিয়াপন্থী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের ওপর চাপ তৈরি করেছিলেন। ইউক্রেন যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর না করে। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হলে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। একই বছর ইউক্রেনের দক্ষিণের এলাকা ক্রিমিয়াকে দখল করে রাশিয়া। তার সাথে পূর্বাঞ্চলের দুটি এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিদ্রোহে সমর্থন দেয়। তখন থেকেই ইউক্রেনের বাহিনীর সঙ্গে আট বছর ধরে লড়াই চলছে। লড়াইয়ে প্রায় ১৪ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

একটি যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। ২০১৫ সালে মিনস্ক শান্তি চুক্তি। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার আগে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত দুটি এলাকা দোনেৎস্ক ও লুহানস্কে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ওই শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেন পুতিন।

২।

ইউক্রেনের দাবি হল ইউক্রেনে কোনো নাৎসি বা গণহত্যার আক্রমণ ঘটেনি। বরং রাশিয়ায় ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের শান্তি নষ্ট করেছে। পুতিন বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিয়ে চলেছে। এখন তারা দেশের নাগরিকদের উপর জোর করে আক্রমণ করছে। দেশ তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। নাগরিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের এই দখলদারিত্বের প্রতিবাদ করছে।

৩।

রাশিয়ার দাবি হল ইউক্রেনে বসবাসাকারী রুশ ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর উপর ইউক্রেন নিপীড়ন করছে তাই এই আক্রমণ। নব্য-নাৎসি বলেও তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে আখ্যায়িত করেন। পুতিন বলেন যে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করে রাশিয়ার নিরপত্তা হুমকির মুখে ফেলেছে। তাই রাশিয়া ইউক্রেনের ন্যাটো জোটে যোগদানে বাধা দেওয়ার দাবি জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্র রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ বা আক্রমণ করার পরিকল্পনার জন্য অভিযুক্ত করেছিল। কিন্তু রাশিয়ার কর্মকর্তারা ২৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বারবার তা অস্বীকার করে।

ডনবাসের দুটি স্বঘোষিত রাষ্ট্র দোনেৎস্ক ও লুহানস রাশিয়া পন্থী বিদ্রোহীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির পরের দিন, রাশিয়ার ফেডারেশন কাউন্সিল বিদেশে সামরিক শক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দেয় এবং রুশ সেনারা উভয় অঞ্চলে প্রবেশ করে। ২৪শে

ফেব্রুয়ারি সকালে আক্রমণ শুরু। পুতিনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন দখল করে নেওয়া। শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আনা। যাতে ইউক্রেন কখনো পশ্চিমা সামরিক জোট নেটোতে যোগ দেয়ার আগ্রহ না দেখাতে পারে।
রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের সর্বত্র ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা শুরু হয়। পাশাপাশি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক ও চল্লিশ মাইল দীর্ঘ স্থলবাহিনী আক্রমণ শুরু করে।

৪।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘে ভোটাভুটি হয়। ১৪১ দেশ রাশিয়ার বিপক্ষে ভোট দেয়। ৫ টি দেশ রাশিয়ার পক্ষ নেয়। ৩৫টি দেশ নিরপেক্ষ থাকে। তার মধ্যে অন্যতম ভারত ও চিন। আন্তর্জাতিকভাবে এই হামলার ব্যাপক নিন্দা করা হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে হামলার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সম্পূর্ণভাবে হামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাশিয়াকে সামরিক অভিযান স্থগিত করার নির্দেশ দেয় এবং ইউরোপীয় কাউন্সিল রাশিয়াকে বহিষ্কার করে। অনেক রাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যা রাশিয়া ও বিশ্বের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। ইউক্রেনকে মানবিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করে। রাশিয়া ও বেলারুশ থেকে পণ্য ও পরিষেবা প্রত্যাহার করে। এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত মিডিয়া সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয় ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ইউক্রেনের মত একটা ছোটো দেশ কীভাবে রাশিয়ার সাথে দীর্ঘ ১০০ দিন ধরে যুদ্ধ চালাছে? আসলে যুদ্ধ ইউক্রেনে হলেও যুদ্ধ চলছে মূলত ন্যাটো বা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার। যুদ্ধক্ষেত্রটা ইউক্রেন। ইউক্রেনকে ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য লাগাতার অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, অর্থ ও রণকৌশল দিয়ে সহযোগিতা করছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেন ইউক্রেনকে সর্বতভাবে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। ইইউ যত দেশ আছে তাদের সকলে এগিয়েও এসেছে এই যুদ্ধের সাহায্য করতে। ইইউ ২৭ টি দেশের মধ্যে ২১ টি দেশই সেখানে অর্থ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের বেশকিছু দেশে ন্যাটো বাহিনী মোতায়েন করেছে। ব্রিটিশ বাহিনীও পাঠানো হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানি যুদ্ধে ইউক্রেনকে সহযোগিতা করতে ব্যস্ত।

৫।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বর্তমানে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। বিশেষত বুচাতে যেভাবে রাশিয়া আক্রমণ করেছে সাধারণ নাগরিকদের উপর তারজন্যই আন্তর্জাতিক আলাদতে যুদ্ধাপরাধী বলে পুতিনকে অভিযুক্ত করা যায় কিনা ভাবনা চলছে। ভারত ও চিন বুচা গণহত্যার নিন্দা করেছে। রাশিয়ার যুদ্ধ অপরাধের কয়েকটি কারণ হল-
ক) ক্লাস্টার বোম, ভ্যাকুয়াম বোম এর ব্যবহার করা। যা ইউক্রেনের নাগরিকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
খ) নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর আক্রমণ চালানো।
গ) স্কুল, হসপিটালে আক্রমণ হানা। প্রভৃতি।

৬।

রাশিয়া প্রথমে বেলারুশ ও ইউক্রেনের দুটি বিদ্রোহী অঞ্চল ক্রিমিয়া ও ডনবাস থেকে ইউক্রেনের উপর বহুমুখী আক্রমণ চালাতে থাকে। চারটি প্রধান ফ্রন্ট গড়ে তারা ক্ষেপনাস্ত্র চালায়। কিয়েভ ফ্রন্ট, উত্তর-পূর্ব ফ্রন্ট, পূর্ব ইউক্রেন আক্রমণ এবং দক্ষিণ ইউক্রেন আক্রমণের ফ্রন্ট। রুশ সেনাবাহিনী চেরনিহিভ, খারকিভ, খেরসন, কিয়েভ, মারিউপোল ও সুমির প্রধান প্রধান ইমারত, সেনাবাহিনীর দপ্তর, টিভি টাওয়ার প্রভৃতির উপর বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। কিন্তু এই আক্রমণের কঠোর প্রতিরোধ ও মোকবিলা গড়ে তোলে ইউক্রেন বাহিনী। রুশ বাহিনীকে আক্রমণে বাধা দেয়। কিয়েভ সহ অন্যান্য এলাকার সাধারণ নাগরিকরা রুশ বাহিনীর ট্যাঙ্কের সামনে এসে প্রতিবাদ করে। রুশ সেনারা বেকায়দায় পড়ে যায়। পরবর্তীকালে দেখা যায় রুশ সেনারা সাধারণ বাড়ি, হাসপাতালে আক্রমণ করলে বেসামরিক জনগণের হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা বিশ্ব অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিশ্বের ব্যাংক লেনদেনের ব্যবস্থা 'সুইফট' থেকে রাশিয়ার বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ৬৩০ বিলিয়ন ডলার ফ্রিজ করা হয়েছে। এতে রাশিয়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করতে পারবেনা। রুবলের দাম ২২ শতাংশ পড়ে যায়। আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। দেশের মুদ্রাস্ফীতি ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।
দেশের জনগণ এটিএম থেকে নিজেদের অর্থ তুলে নিতে থাকে। বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশে থাকা রাশিয়ার প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ব্যবহার করতে বাধা দেয়। যে অর্থ রাশিয়া বিদেশের ঋণ পরিশোধ করতে পারত। তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটেন একই পথে হাঁটে। তাদের দেশে থাকা রাশিয়ার ব্যাঙ্কগুলির অর্থ ফ্রিজ করে দেয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কিছু দেশ রাশিয়ার প্রায় ১০০০ ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যেমন বিজনেস গ্রুপ অলিগারস, বার্সালোনা প্রভৃতি।

প্রেসিডেন্ট পুতিন ও বিদেশমন্ত্রী সাগ্রেই লাভরভ এর আমেরিকায় থাকা অর্থ ফ্রিজ করা হয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড, কোকা কোলা, স্টারবার্গ, মার্কস এবং স্পেনসর প্রভৃতি প্রায় ১ হাজার কোম্পানি তাদের ব্যবসা রাশিয়া থেকে তুলে নিয়েছে। কেবলমাত্র রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এই যুদ্ধ।

৭।

যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র বিশ্বে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক হ্রাস ঘটে। বিশেষ করে জ্বালানি ও পেট্রোলিয়ামজাত তেলের দাম বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া সারা বিশ্বে জ্বালানী তেলের প্রায় ১০ শতাংশ রপ্তানি করে। যা বিশ্বে দ্বিতীয়। সৌদি আরবের পর। ফলে পশ্চিমা দেশগুলিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে রপ্তানি কমিয়ে দিতে পারে। পথমেই ক্রুড ওয়েল এর দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ১৩০ মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। বিভিন্ন দেশ তারজন্য তেলে কর ছাড় দেয়। যেমন - ফ্রান্স, হাঙ্গেরি প্রভৃতি। এ তো গেল তেলের কথা। ইউরোপীয় দেশগুলি যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস বা জ্বালানি ব্যবহার করে তার ৩৫ শতাংশ রপ্তানি করে রাশিয়া। তারা জ্বালানি গ্যাসের রপ্তানিও কমাতে পারে। যেজন্য বড় প্রভাব পড়বে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যে। পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই এলএনজি গ্যাস (Liquefied Natural Gas) ব্যবহারের কথা ভাবছে। তা খুবই খরচ সাপেক্ষ।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও রাশিয়া ও ইউক্রেন পৃথিবীতে অন্যতম স্থান অধিকার করে রয়েছে। কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ রপ্তানি করে রাশিয়া ও ইউক্রেন। বিশ্ববাজারে ইউক্রেন যেসব শস্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে তার মধ্যে রয়েছে সূর্যমুখী তেল, ভুট্টা, গম এবং বার্লি। ফলে বিশ্বের এই সকল বাণিজ্যিক শস্যের পণ্যগুলির দাম অনেকটাই বেড়ে যাব।

সামগ্রিকভাবে খাদ্যশস্য, গ্যাস, জ্বালানি তেল, রাসায়নিক সারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও রাসায়নিক সারের দাম গত কয়েক বছরের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। এসব পণ্যের দাম বেড়ে গেলে দেশে কৃষি ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়বে। বাড়বে পরিবহন খরচও।

এই সকল দিক ভেবে বিশ্বব্যাঙ্ক আর্থিক বৃদ্ধির যে মাত্রা ছিল ৪.১ তা কমিয়ে ৩.১ এ নামিয়ে এনেছে।

৮।

ইউক্রেনে ভারতের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী মেডিক্যাল কোর্সের পড়াশোনা করছিল। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু আগেই ৪ হাজার ছাত্র বাড়ি ফিরতে পেরেছিল। আটকা পড়ে ১৬ হাজার। যুদ্ধের দামামা যখন বাজতে চলেছে, তখন তারা ট্যুইট করে ভারত সরকারের কাছে দেশে ফেরার আবেদন করেন। কিন্তু সরকার কোনো কর্ণপাত করেনি। যুদ্ধ শুরু হলে তাদের বাড়ি ফেরা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। বিমান ভাড়া বেড়ে যায়। ইউক্রেনে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় কর্ণাটকের ২১ বছর বয়সী নবীন শেখারাপ্পা ১ লা মার্চ খারকিভে যুদ্ধে মারা যায়। এরপর ভারতের টনক নড়ে। বিদেশ মন্ত্রক তাদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয়। যারা আটকে ছিল, তাদের পোল্যাণ্ড সীমানায় যেতে বলেন। ছাত্ররা দীর্ঘ পথ হেঁটে পোল্যাণ্ডে পৌঁছায়। সেখান থেকে সরকার তাদের বাড়ি নিয়ে আসে।

৯।

বর্তমানে রাশিয়া তাদের সেনাবাহিনী ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় সমবেত করছেন। তাদের বক্তব্য সেনাদের পুনর্গঠনের জন্য এটা করা হচ্ছে। মে মাসের মাঝামাঝিতে তারা খারকিভ শহর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় বলে ইউক্রেনের পক্ষে দাবি করা হয়। তবে এটা পুরোপুরো পশ্চাদপসারণ নয় বলেই সাংবাদিকরা মনে করছেন। কিন্তু এটা ইউক্রেনের সাময়িক জয় বলেই তারা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে রাশিয়া মারিওপোল ও ডনবাস অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। এখন লুহানস্কের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রুশরা। পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতে আরো কিছুদিন হয়তো সময় লাগবে। অন্যদিকে দোনেৎস্কেরও একটা বড় অংশ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

রাশিয়ার মূল উদ্দেশ্যগুলি কী পূরণ হয়েছে? এই প্রশ্ন এখন পশ্চিমা কর্মকর্তাদের মুখে। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী কিয়েভ ও তার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু রুশ বাহিনী তা পারেনি। সেখান থেকে সরে গিয়েছে ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রতি-আক্রমণে। হলোস্টেন বিমান ঘাঁটিও তাদের হাতছাড়া হয়েছে। বর্তমানে তারা ডনবাস ও মারিওপোল শহর দুটি পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

১০। ইউক্রেন যুদ্ধে কার লাভ কার ক্ষতি। রাশিয়া কী লাভবান হবে? নাকি ইউক্রেন ? নাকি অন্য কেউ। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এত তৎপর কেন?

আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ফিরিয়ে আনার ফলে বিশ্বরাজনীতিতে একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়। আমেরিকার বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলি ন্যাটোর সৈন্যদের দেশ থেকে তুলে নেওয়ার কৌশল নিতে থাকে। ন্যাটোর জন্য অর্থ বাজেট তারা কমাতে থাকে। অর্থাৎ তারা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। ফ্রান্স ও জার্মানি এই সাহস মূলত দেখায়। তাছাড়া ইউরোপের দেশগুলিকে বিভিন্ন দেশের উদ্বাস্তুদের দায়িত্বভার বহন করতে হচ্ছিল। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, ইউরোপের নিরাপত্তা বিধান ইউরোপ নিজেই করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে মৌখিকভাবে রাশিয়া আক্রমণের জুজু দেখিয়ে আসছিল। কিন্তু সিরিয়া ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অপসারণ বা পরাজয়ে তা আর সম্ভব হচ্ছিল না। যে কারণে আমেরিকার একটা যুদ্ধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সেটা ইউরোপের দেশে। এই মোক্ষম সময়ে দেখা দিল ইউক্রেন সংকট। ইউক্রেনকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা বিভিন্নভাবে উসকানি দিতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিযোগী রাশিয়া ও চিন। অতএব রাশিয়া তার সীমানার পাশে ন্যাটোর উপস্থিতি কখনোই মেনে নিতে পারবেনা। ২০০৪ সালে রাশিয়ার প্রতিবেশি দেশ লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া ন্যাটোভুক্ত হয়। তখন রাশিয়া এর বিরোধিতা করার মতো অবস্থায় ছিলনা। আর রাশিয়ার সীমানাটাও খুব বেশি নেই দেশগুলোর সাথে। কিন্তু ইউক্রেনের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সীমানা অনেক বেশি। অর্থনৈতিক কারণেও ইউক্রেনকে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। কেননা ভূমধ্যসাগরে সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চলাচল করতে হলে কৃষ্ণসাগর দিয়ে যেতে হবে। ইউক্রেন তাই হাতে থাকা প্রয়োজন। কৃষ্ণসাগরে ন্যাটো সেনার উপস্থিতি সেই বাণিজ্যের উপরও প্রভাব ফেলবে।

অতএব ফ্রান্স ও জার্মানি তথা ইউরোপীয় দেশগুলিকে দমিয়ে রাখতে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। এটাও লক্ষ্যণীয় যে যুদ্ধ বিরতি কিংবা শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও জার্মানি সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ইউরোপের ছোটো ছোটো দেশগুলি অলরেডি ন্যাটোর সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান প্রকাশ করে দিয়েছে। যেমন- সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা ভয় পাচ্ছে কখন তাদের দেশে আক্রমণ হয়। যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছিল তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ফ্রান্স ও জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের তথা ন্যাটোর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। ন্যাটোর সেনা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন হল ইউক্রেন কেন যুদ্ধে এসে গেল? ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের পূর্বপরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের উসকানিতে তারা রাশিয়ার কঠোর বিরোধিতা করতে থাকে। ইউক্রেন ভেবেছিল যুদ্ধ শুরু হলে ন্যাটো বাহিনী তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করবে। তার পূর্ব পরিকল্পনা যুদ্ধ বাস্তবতার সাথে মিলছে না। অতএব বলা যায় যে তারা যুদ্ধে পরাজিত। কেননা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন যাবতীয় সহযোগিতা করলেও যুদ্ধ শুরুর পর বারবার বলেছে তারা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করবে না। রাশিয়াও ন্যাটো বাহিনীকে ইউক্রেনে ঢুকতে দেয়নি।

১১।

এই যুদ্ধ মানবতার মুক্তির যুদ্ধ নয়। কিন্তু মানবতা লাঞ্ছিত হচ্ছে। ইউক্রেনে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পশু-পাখির জীবনযাপন করতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের। তাদের কী স্বার্থ আছে? তারা তো চায় সুস্থ জীবন। শান্তি। পরোক্ষভাবে গোটা বিশ্বের মানুষের উপর যুদ্ধের কারণে কর্পোরেটদের শোষণের তীব্রতা বাড়ছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছেনা। আর্থিক চাপ বাড়ছে । বিশ্বের দুই যুযুধান অপশক্তির কবলে আজকে মানবতা নিষ্পেষিত। তাদের কাছে মানবতার কোনো মূল্য নেই। ইউক্রেনের শহর-গ্রামগুলির দিকে তাকালেই দেখা যাবে গোটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব আজ দেখছে রক্ষণকামিতার উলঙ্গ তাণ্ডব। বিশ্ব রক্ষ এমনি ফানুস তৈরি করেছে, কোথাও পুতিনকে তো কোথাও জেলেনেস্কিকে দায়ী করছে। কিন্তু এদের আড়ালে রক্ষ হাসছে, মানবতাকে গিলে খাচ্ছে। তাকে তো অত সহজে দেখাও যায় না, ধরাও যায় না। প্রতিবাদ অবশ্যই চলছে। দানবের বিরুদ্ধে মানবের প্রতিবাদ সৃষ্টির শুরু থেকেই। তা অনন্তই। তাই আপাতত জোর যার মূলক তার— এই রাক্ষুসেপনা জয়ী হলেও তার আয়ু বেশি দিন নয়।

গল্প

ট্যাড়া

বরুণ শ্যেন

পাড়ায় ক্রমেই ব্যাপারটা রটে গেল। রটে গেল বলার চেয়ে বরং বলা ভালো রাঙিয়ে রসিয়ে মুখরোচক বিষয় হিসাবে উপস্থিত হল। সবুজ যে তার বাবাকে (ধাক্কা দিয়ে) সরিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা পাল্টে গিয়ে রটল বাবার গালে সপাটে একটা চড় কশিয়েছে। উপস্থিত কেউ কেউ নাকি সবুজের বাবার মুখ থেকে রক্তও ঝরতে দেখেছে। পুব পাড়ায় রটেছে সবুজ নাকি তার বাবাকে চড় ঘুষি লাথি সবই মেরেছে। আশেপাশের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে লোক লজ্জার ভয়ে নাকি সবুজের বাবা যেতে চায় নি। কিন্তু চোখে মুখে ব্যাথার যন্ত্রণা নাকি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে শুনে সবুজের একমাত্র জামাইবাবু শরিয়ত সবুজের বাড়ি আসছিল। পুব পাড়ায় একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছে রঙ চড়ানো কথাটা শুনে মেজাজটা আরো খচে গেল। ঝড়ের গতিতে তার বুলেট মোটর সাইকেল নিয়ে সবুজদের বাড়ি এসে উপস্থিত হল।

চোখমুখ থেকে রাগ ঠিকরে যেন বের হচ্ছে শরিয়তের। শাশুড়ি মা কে সামনে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠার মতো বলে, আপনারা পেয়েছেন টা কি, সবজ্যাটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

শাশুড়ি মা শান্ত গলায় বলেন, তেমন কিছু হয় নি বাবা, বস, সব বলছি।

ততোধিক গলা চড়িয়ে শরিয়ত বলে, আপনাদের জন্য মান-সম্মান আর কিছু রইল না। আগে জানলে এই বাড়িতে আমি বিয়েই করতাম না। সবুজকে ডাকার মতো করে বলে, সবজ্যাটা কোথায়?

সবুজ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সে ভালোভাবে জানে এই লোকটার আদ্যপান্ত নেগেটিভ স্বভাবের। সমস্যা বাড়ানোটাই তার কাজ। অর্থের দাপটে অন্যদের মানুষ বলে মনে করে না। না মানে কোনো যুক্তি, না আছে কোনো আবেগ। সবজান্তা গামছাওয়ালার মত একাই আসর গরম করতে চায়। বিশেষ করে তাদের বাড়ির সমস্ত ব্যাপারে তার পণ্ডিতি মূলক কথা চালানোর চেষ্টা করে।

বলুন, কী হয়েছে। সবুজ দরজার কাছে বেরিয়ে এসে বলে।

শরিয়ত সবুজকে দেখে রাগান্বিত স্বরে বলে, তোর বাপের গায়ে হাত তুলেছিস কেন? খুব মস্তান হয়ে গেছিস নাকি?

শান্তস্বরে সবুজ বলে, কী হয়েছে না হয়েছে মা আপনাকে বলছে, আপনি শুনুন, অযথা মাথা গরম করবেন না।

কেনে রে, মাথা গরম করলে কী হবে?

মাথা গরম করার কিছু বিষয় নেই, তাই। আপনি যাদের কাছে শুনেছেন তারা বানিয়ে বানিয়ে আপনাকে অনেক কথা বলেছে, তেমন কিছু হয়নি।

'তেমন কিছু হয় নি' ভেঙচি কেটে বলে, 'এমনি এমনি মানুষ বলছে তাই না।'

আব্বা একটা ভুল করছিল, সেটাতেই বাধা দিয়েছি, আর তেমন কিছু নয়। মায়ের উদ্দেশ্যে বলে, উনাকে কিছু খেতে দাও, আমি বের হচ্ছি।

লাট সাহেব, নাকি? যখন যা ইচ্ছা হবে তাই করবি? এখনো পর্যন্ত বাপের ঘাড়ে বসে বসে খাচ্ছিস। বাপের টাকা পয়সা উড়িয়ে শিক্ষিত হয়েছিস। সেই বাপের ভুল ধরতে যাচ্ছিস! আবার সেই বাপের গায়ে হাতও তুলছিস!

সবুজ ইংরেজিতে এমএ করেছে। বর্তমান চাকুরির দুর্মূল্যের বাজারে এখনো তার চাকুরি হয়নি। কিছু ছেলে মেয়ে পড়িয়ে নিজের হাত খরচ চালায়। তার পরেও কিছু টাকা প্রতি মাসেই তার মায়ের হাতে দেয়। সে জানে, যে তিন চার বিঘা জমি তাদের আছে, তা থেকে যে ফসল হয় তাতে সংসার ভালোভাবে চলে না। চারিদিকে ফড়েরাই চাষিদের মুনাফা লুটে নিয়ে যায়। ধান পাট গম উঠলে চাষিদের যত কম পারা যায় দিয়ে সেগুলো কিনে গুদামজাত করে। তার জামাইবাবুও সেই রকমই একজন আড়তদার। পরের ধনে যার পোদ্দারি তার কথা শুনতে আর ভালো লাগছিল না সবুজের। সে কিছু না বলে তার সাইকেল খানি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

শরিয়ত চেঁচিয়ে ওঠে, পালাচ্ছিস কেন, কথার উত্তর দিয়ে যা। বাড়িতে তামাশা না করে বাইরে খাটতে চলে যা না।

সবুজ বলে, আমারটা আমাকেই ভাবতে দিন। আপনি এ বাড়ির জামাই, জামাই-এর মত থাকুন।

সবুজের আর কোনো কথা শোনার ইচ্ছে নেই। সে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। শরিয়ত তার শাশুড়িকে নালিশ করে, সব নষ্টের গোড়া আপনারা। একটা ছেলে বলে কোনো দিন কিছু বলেন নি। ছোট থেকে যদি পেছনে পড়তো, তাহলে এমন হত না।

শাশুড়িমা জামাইকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বলে, বাবা

তোমার শ্বশুর আসুক, তুমি তার সঙ্গে কথা বলো। হাত মুখ ধুয়ে ঘরে বসো। আমি তোমাকে চা দিচ্ছি।

ঘন্টা দুয়েক পরে মাঠে থেকে সবুজের বাবা আসে। একেবারে স্নান টান করে মাটির দাওয়ায় বসে সবুজের মার কাছে খাবার চায়। সে জামাই এর ব্যাপারে কিছুই জানে না। সবুজের মা জামাই এর কথা বললে ঘরে উঠে যায়। শরিয়ত তখন হেডফোন কানে লাগিয়ে একটা হিন্দি গানের ভিডিও দেখছিল। শ্বশুরকে দেখে, আসসালামালাইকুম আব্বা, বলে পাশে হেডফোনটা খুলে মোবাইলটা উল্টে রাখল। তারপর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইল, আপনার শরীর কেমন আছে এখন।

পরস্পর কুশলবিনিময় হওয়ার পর, শরিয়ত জানতে চায়, সবুজ আপনার গায়ে কেন হাত তুলেছিল, আব্বা?

সবুজের আব্বা হাসে। বলে, মানুষে আজে বাজে রটিয়েছে। ও আমার গায়ে হাত তুলবে কেন!

কোনো রকমের সুবিধা করতে না পেরে শরিয়ত লেজ গুটিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। পরের দিনই সবুজের দিদি এসে হাজির। আসলে শরিয়ত বাড়ি ফিরে সবুজের দিদি সারমিনকে প্রচুর অপমানজনক কথা শুনয়েছে। ছোটো লোকের পরিবারে বিয়ে করে তার মাথা হেঁট হয়ে এসেছে। এই রকমই আরও অনেক কিছু।

সারমিন জানতে চেয়েছিল ঘটনাটা, শরিয়ত জানায় নি। বরং বলেছিল, বাপের বাড়ি যা, গিয়ে বল ছোটোলোকি ছাড়তে। আর যদি এই রকমই চলতে থাকে, তাহলে তুইও থেকে যাস, আর আসতে হবে না।

শরিয়ত স্বভাবত রেগে গেলেই সারমিনকে তুই সম্বোধন করে। শুধু তাই নয় বারবার তার বাপের বাড়ির নামে আজে বাজে বলতে থাকে। সারমিন প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করতো। যদিও তাতে আরও বেড়েই যায় ব্যাপারটা। তাই এখন আর কিছু বলে না, আড়ালে চোখের জল ফেলে শুধু। সে জানে এই যে ব্যাপারটা তার স্বামী যে ভাবে দেখছে তার হয়তো কিছুই সত্য নয়। তবু স্বামীর অপমানজনক কথা সহ্য করতে না পেরে সকাল সকাল হাজির।

সবুজ টিউশন শেষ করে তার সাইকেলটিতে তেল দিচ্ছিলো দাওয়ায়। সে তার এই একমাত্র বাহনের খুব যত্ন করে। সে দুজনকে হোম টিউশন পড়ায় সেখানে যাওয়া, তাছাড়া বাজার বা অন্যান্য প্রয়োজনে এই সাইকেলটি বিশেষ সহায়। সে তার সাইকেলটিকে স্ট্যান্ডের উপর টেনে প্যাডেল ঘুরিয়ে পেছনের চাকাটি ঘুরিয়ে দিদির দিকে চোখ তুলে দেখে, কিছু বলে না।

সারমিন তার সামনে একটা বস্তা টেনে নিয়ে বসে। সে একবার ভাই-এর দিকে তাকায় একবার সাইকেলের দিকে। সেও কিছু বলতে পারেনা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বলে, কী, কিছু বলছিস না কেন?

সবুজের দিদির কথায় একটু খারাপই লাগে। এই দিদি ছাড়া সে কিছু বুঝতো না। দিদির বিয়ের সময় প্রচুর কান্না করেছিল। এমনকি বিয়ের পরও মাঝে মাঝে দিদির বাড়ি চলে যেত। একটা সময়ের পর তার জামাইবাবুর ব্যবহারের কারণে নিজে থেকেই আর যায় না সেখানে। তাই বলে তার প্রিয় দিদি বাড়ি এলেও নিরুত্তর থাকায় তার নিজেরই অপমান লাগছে এখন। সে বলে, সরি রে দিদি। আসলে আমার মন ভালো নেই।

হুম, বুঝছি জামাইবাবুর রাগে আমার সাথে কথা বলছিস না। মা কোথায়?

কোথায় গেল যেন, তুই ভাল আছিস।

সারমিন মিথ্যে বলতে পারে না, তাই চুপ করে থাকে। ভাই এর দিকে তাকিয়ে মায়া হয়। দু নম্বর পথে কত ছেলের চাকুরি হয়ে যাচ্ছে। অথচ তার ভাইটা পড়াশোনায় এতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ পাচ্ছে না। মা বাড়ি এলে সারমিন বলে, কী ব্যাপার কোথায় গেছিলে?

তারপর মা মেয়ের কিছু কথা হওয়ার পর, সারমিন ঝামেলার ব্যাপারটা জানতে চায়।

আমাদের পাটের জমিতে তোর চাচিদের ছাগল লেগেছিল। সেটা বলাতে তোর চাচি আর তার ছেলে চেঁচামেচি শুরু করে। তোর বাবাও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেছিল। ছেলের বয়সি ভাতিজার কথা শুনে রেগে পাশেই একটা পড়ে থাকা কঞ্চি তুলে মারবো বলে। তাতে ওরা আরো রেগে গিয়ে লাঠি বের করে আনে। সবুজ শেষের দিকে গিয়ে দেখে এই অবস্থা। তার আব্বার কাছ থেকে কঞ্চিটা কেড়ে নেয় জোর করে। আব্বাকেই কয়েকটি কথা শোনায়। এই ঘটনাকেই ওখানকার লোকেরা বাড়িয়েছে। কেউ কেউ তো আমাদের বাড়িতে এসে উস্কানিও দিচ্ছিলো, সবুজকে বলছিলে বাপের উপর মর্দানি না করে চাচাতো ভাইকে দুটো দিতে পারতিস। তোর ভাই, ঝামেলা না বাড়িয়ে তাদের বলেছে, আপনারা যান, আমাদের সমস্যা আমরা মেটাচ্ছি। জানিস তো আমাদের বাড়ির আশেপাশের মানুষ কী ভাবে আমাদের দুটো সংসার আলাদা করেছিল কথা লাগিয়ে। এখনও সেই কাণ্ডকারখানা চালিয়ে যাচ্ছে।

সারমিন বুঝতে পারে সব। ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, সবুজ, তোর অন্যায় আমি কখনো দেখি নি। তবু বলছি তুই তোর দাদার সঙ্গে বাজেভাবে কথা বলিস না।

সবুজ এবার উঠে এসে দিদির পাশে দাঁড়ায়। বলে, আর কতদিন ওই বাজে লোকটার অত্যাচার সহ্য করবো। তোর উপর অত্যাচার তো করেই চলেছে! এবার রুখে দাঁড়া। না হলে ও থামবেনা। সারমিন নিরুত্তর চেয়ে থাকে।

লড়াই

কস্তুরী

এমনি সর্বনাশা বর্ষা লেগে আছে, মাথা গোঁজার ঠাঁই টুকু মনে হয় এবার আর থাকবে না। ফুলজান ধসে যাওয়া মাটির বারান্দাটির দিকে তাকিয়ে বলে, স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকুও ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে মনে হয় এই আগ্রাসী বর্ষা। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ফুলজান এই বারান্দায় শুয়ে থাকতো। কত রাত গেছে কেটে না ঘুমিয়ে। খোলা আকাশের দিকে চেয়ে রাতের এক ফালি চাঁদ দেখে। অদূরে কুকুরের এক নাগাড়ে কান্না শুনতে শুনতে মনে পড়ছে সেদিনের কথা— এক অসহায় নারীকে তার ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিল তৎকালীন সময়ের শাসক দলের পান্ডারা। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ফেরা হয়নি ফুলজানের স্বামীর। গভীর রাতে পাড়ার একদল যুবক রক্তাক্ত লাশ দিয়ে গিয়েছিল ফুলজানকে।

এই বারান্দায় ফুলজানের স্বামীকে শেষ গোসল দেওয়া হয়েছিল। কাদামাটি দিয়ে বারান্দাটির ধার বাঁধাচ্ছে ফুলজান। উঠান থেকে একজন চিৎকার করছে ভাবি বাড়িতে আছো? কে ভেতরে এসো। ও বদি কী হয়েছে? এত ডাকাডাকি করছো কেন? আরে ভাবি তোমার বাপের শরীর ভালো নাই। ধান কিনতে গিয়েছিলাম তোমার বাপের গাঁয়ে। তাই ভাবলাম তোমাকে খবরটা দিয়ে যায়। জমির লাউ, বেগুন, ঝিঙে, ডাঁটাশাক, পটল নিয়ে ফুলজান তিন ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করে বাপকে দেখতে হাজির। গত দুবছর আগে গত হয়েছে ফুলজানের মা। এখন বাড়িতে ভাই ভাবিদের রমরমা রাজত্ব। বড়ভাই ডিলার। টাকার শেষ যেমন নাই তেমনি আত্মদম্ভেরও অভাব নাই। ছোট ভাই পাটের ব্যবসায়ী তারও খুব বোলবোলাও। ফুলজান দরজায় গিয়ে ডাক দেয় কই গো রহমতের মা— রহমত ফুলজানের বড় ভাইয়ের একমাত্র ছেলে।

কেউ সাড়া দেয় না। ফুলজান দরজায় বসে পড়ে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত। ডিলারের বাড়ি। বিশাল মহল। দরজা তো নয় ফটক! রাজরাজাদের মতো! অনেকক্ষণ পরে রহমতের মা দরজা খোলে। কে? তুমি, আমি ভাবছি কোনো ব্যবসার লোক। হ্যাঁ ভাবি আমি, বাপুর শরীর ভালো নাই শুনে ছুটে এলাম। বলেই ফুলজান অন্যমনস্ক হয়ে যায়, ব্যবসার লোক বলে ভাবি দরজা খুলল। আমার কথা জানলে হয়তো দরজাই খুলতো না। মুখ ঝামটা দিয়ে রহমতের মা বলে- বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে যে কি এত ভাবছো! ভেতরে যাও। এসেই যখন পড়েছো নাকি ভাইদের বড় দালান দেখে হিংসে হচ্ছে? তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব অস্বস্তিতে ধীর পায়ে ভেতরে ঢোকে ফুলজান। বাপু বাপু তুমি কেমন আছো? বাপ তখন লালগোলার বড় ইলিশ মাছের পেটি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। বাপের খাতির করে রহমতের মা কারণ ডিলারের ব্যবসাটা বাপু বড় ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছে। ছোট ভাইকে ডিলারির বদলে পাঁচ বিঘে বেশি সম্পত্তি দিয়েছে। তবু ডিলারি আর জমি সমান? তাই ছোট ভাই বড় ভাইকে পেরে উঠে না। অতএব রহমতের মাকে শ্বশুরকে একটু বেশিই তোয়াজ করতে হয়। বাপু তোমার শরীর নাকি ভালো নাই?

বাপু - ও তুমি? তুমি আবার কিজন্য অতদূর থেকে আসতে গেলে। ওই একটু বমি পায়খানা হয়েছিল এখন ভালোই আছি। তোমার ভাই ভাবি তো আমাকে আদর যত্নে রাখে। সকালে খালেদা এসেছে ফল, মিষ্টি, পাজামা,পাঞ্জাবী নিয়ে। এতক্ষণ ফুলজান লক্ষ্য করে নি তার ছোট বোন খালেদা ঘরে খাওয়া দাওয়া করছে। আর বড় ভাবি হাওয়া করছে। এই বোনের বিয়ে দিয়েছিল ফুলজানের স্বামী ঘটা করে। আজ অর্থের অভাবে ফুলজান ব্রাত্য। স্বামী যখন জীবিত ছিল ফুলজানের যত্নে ক্রুটি হয় নি। আজ সবই অতীত।

ফুলজান— কখন এলি খালেদা কেমন আছিস?

খালেদা— সকালে রফিকের আব্বা চার চাকা ভাড়া করে রেখে গেছে। ড্রাইভার আবার আসবে, চলে যাব।

ফুলজান— ও

খালেদা— বুবু তোর জন্য কখানা শাড়ি এনেছিলাম নে ধর।

ফুলজান— কেন,আমাকে শাড়ি কেন?

খালেদা— তোর এখন অভাব, সংসার চালাতে নাভিশ্বাস...

ফুলজান— আমার কথা তোরা এত ভাবিস কই একদিনও তো দেখতে আসিস না। ফুলজান শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে এই শাড়িগুলো বিয়ের সময় ফুলজান কিনে দিয়েছিল খালেদাকে। সময়ের কি পরিহাস!

মনে পড়ে সেদিনের কথা স্বামীর দাফন কাফন সেরে দাওয়ায় বসে আছে ফুলজান। কে যেন লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়িতে ঢোকে - কে বাপু। বাপকে দেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে ফুলজান। জামাইয়ের মারা যাবার দিন জমসেদ কাফনের টাকা ও দু বস্তা চিনি এনেছিল আমার দোকান থেকে লোকজনকে শরবত দেওয়ার জন্য তার টাকাটা নিতে এসেছি। পিঠে যেন চাবুকের আঘাত লাগলো ফুলজানের, চোখের জল নিমিষে শুকিয়ে গেল, শোকার্ত ফুলজান মুহূর্তে জেগে উঠলো, উঠান থেকে ঘরে গিয়ে

একটা গয়না এনে বাপের হাতে দিয়ে বললো মৃত স্বামীকে তোমার কাছে ঋণী রাখতে চাই না।

দাসত্ব

আব্দুল মোমিন

দেড় বিঘা জমি নিয়ে আশীর্বাদ মেস। চারিদিকের সীমানা এক মানুষ উঁচু ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মেসের সামনের দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দুতলা দুটি বিল্ডিং। বেগুনি রংয়ের প্রথম বিল্ডিংটির নাম ব্লক 'A' এবং পাশেই চার ফুটের ইট বিছানো রাস্তার পরেই রয়েছে হলুদ রঙের বিল্ডিং ব্লক 'B '। ব্লক 'B' বিল্ডিং এর দক্ষিণ প্রান্তে চার ফুট ইট বিছানো রাস্তার ধারে রয়েছে টালির ছাউনি দেওয়া ভগ্ন পাঁচটি পায়খানা। পায়খানার ঠিক পশ্চিম দিকে প্রায় পনেরো মিটার দূরে প্রাচীরের গায়ে স্নান করার বা খাওয়ার জন্য রয়েছে পাঁচটি ট্যাপকল আর নেট সিমেন্ট করা ইট দিয়ে বাঁধানো মেঝে। ট্যাপের পাশে গ্রিলের গেট। গেটে সব সময় তালা দেওয়া থাকে। গ্রিলের ওপাশেই রেল স্টেশন ও মসজিদ যাওয়ার রাস্তা। ব্লক B-এ ঢোকার মুখেই লাল্টুর সাত ফুট বাই নয় ফুট এর ছোট ঘর। ঘরের জানলার সামনে রয়েছে পায়খানাগুলি। পায়খানার যাবতীয় শব্দ লাল্টুর ঘর থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। তার সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না। সে কী করে! কেউ কেউ বলে, চাকুরির পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করছে। দিল্লিতে তাদের ফ্যামিলি বিজনেস আছে। বাড়ি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। চার বছর থেকে এই মেসেই আছে। লাল্টুর দুধ খাওয়ার অভ্যাস। প্রতিদিন বিকেল বেলায় ঘরের বাইরে কেরোসিন স্টোভে ট্যাপসাটিপসি কালিযুক্ত কড়াইয়ে হাফ লিটার দুধ গরম করে। বিকেলে লাল্টু দুধ গরম করছে। পাশে কাঁঠাল গাছের নীচে কয়েকজন ছেলে 'দমদমের একটি মেয়ে ঘরজামাই পাত্র চাই' তাই নিয়ে আলোচনা করছে। মেয়ের বয়স সাঁইত্রিশ বছর। প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করে। স্যালারি পয়তাল্লিশ হাজার টাকা। ছেলের বয়স সাঁইত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। সুশিক্ষিত ও লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যবান হতে হবে। দমদমে মেয়ের বাবা-মায়ের সাথেই মেয়ের বাড়িতেই থাকতে হবে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না।

ছেলেদের আলোচনা শুনে লাল্টু দুধ গরম করা বন্ধ করে ছেলেদের পাশে যায়। নীল পাঞ্জাবির মধ্যে হাত ভরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার এই পা আর একবার ওই পা নাড়াতে থাকে। মুখে তার মিষ্টি হাসি। কিছুক্ষণ পর ছেলেরা নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। ঘরজামাইয়ের তথ্য দেওয়া ছেলেটির পেছন পেছন লাল্টু তার ঘরে যায়। ছেলেটির কাছ থেকে মেয়েটির সম্পর্কে সব তথ্য নেয়। নিজের যাবতীয় তথ্য হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মেয়েটির কাছে পাঠায়।

পরের দিন সকালে সেই ছেলেগুলো স্নান করার জন্য ট্যাপের কাছে হই হট্টগোল করছে।

সাদার উপর সরু নীল রঙের চেকের লুঙ্গি পরিহিত ধবধবে ফর্সা লাল্টু দ্রুত তাদের কাছে যায়। আগে থেকেই চারজন স্নান করছে। আরো চারজন স্নান করার জন্য বালতি হাতে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। লাল্টুও খালি গায়ে লাল গামছা কাঁধে দ্রুত তাদের কাছে যায়। হাসি হাসি মুখে ট্যাপের পাশে তালা বন্ধ গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গ্রিলের ওই পাশ দিয়ে যাতায়াত করা মানুষদের দাদা, বৌদি, দিদি, কাকা-কাকি বলে সম্বোধন করছে। সালাম দিচ্ছে। কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছে।

আনিস স্নান করে সরে যাচ্ছে দেখে লাল্টু দ্রুত তার বালতিটি ট্যাপের নিচে রাখে। স্নান করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা চারজনের দিকে তাকিয়ে আনিস লাল্টুকে বলে, ওরা অনেকক্ষণ থেকে স্নান করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।....

কথা শেষ করতে না দিয়েই লাল্টু দ্রুত আনিসের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বলে, ওরা গল্প করছে। করুক। কিছু বলো না। আমি স্নান করে নিই। লাল্টুর এমন আচরণ দেখে আনিস বিরক্তিতে চুপে যায়।

লাল্টু মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অন্যরা যাতে কিছু বলার সাহস না পায়।

আনিসের একহাতে বালতি ভর্তি জল আর অন্য হাতে পরিষ্কার করে কাচা পোশাক। সরতে গিয়ে হাত থেকে নামাজ পড়ার টুপিটি পড়ে যায়। লাল্টু দ্রুত টুপিটি তুলে নেয়। তোলার সময় তার মুখের গাম্ভীর্য দূর হয়ে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় টুপিটি পড়ার পরেও ডান হাতে তুলে কাঁধ থেকে হাটু পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নামিয়ে জোরে জোরে ভালো করে ঝাড়ে। তাতেও তার মন সন্তুষ্ট হয় না। ট্যাপটি অন করে টুপিটি ধুতে থাকে। আনিস বারবার বলতে থাকে, ধুতে হবে না। পরিষ্কার জায়গাতেই পড়েছে। ওখানে বসেই কেচেছি সব।

লাল্টু এসব কথায় কোন কান না দিয়ে ভালো করে উল্টে পাল্টে ধোয়। ভালো করে জল নিঙড়ে তারপর আনিসকে দেয়।

ধর্মের প্রতি লাল্টুর আনুগত্য দেখে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো মুগ্ধ হয়। তাদের বিরক্তি ও ক্রোধ দূর হয়ে যায়। লাল্টু সাবান ঘষে গামছা দিয়ে পায়ের গোড়ালি ডোলে

ডোলে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে স্নান করে। সাদা পাঞ্জাবি সাদা লুঙ্গি ও সাদা টুপি মাথায় দিয়ে দুপুরে নামাজ পড়তে যায়।

মসজিদে ইমামের পেছনের কাতারে বা সারিতে ইমামের পেছনেই লাল্টু নামাজ পড়ে। টাকা পয়সাওয়ালা মানুষদের সাথে তার বেশ পরিচিতি। মসজিদের সবার সাথে কোলাকুলি করে। সালাম দেয়। সময় দিয়ে গল্প করে। রাজনৈতিক প্রভাব সম্পন্ন হাতুড়ে ডাক্তারের সাথে লাল্টুর খুব সুসম্পর্ক। ডাক্তারকে তার ফ্যামিলি বিজনেসের গল্প শোনায়। ওষুধ কারখানায় তাদের শেয়ার রয়েছে। তাদের কোম্পানির ও নামিদামি ওষুধের অনেক ছবি প্রতিদিন ডাক্তারকে দেখায়। বাবা ও দাদা দিল্লির বিজনেস দেখাশোনা করে। লাল্টুর গল্পে ডাক্তার মুগ্ধ হয়। ডাক্তারকে তাদের বিজনেসে টাকা ইনভেস্ট করার কথা বলে। যা চার বছরে ডবল হবে। অন্যের কাছ থেকে টাকা তুলে ইনভেস্ট করলে তার একটা পার্সেন্টেজ ডাক্তারকে দেওয়া হবে। ডাক্তার নিজে তিন লাখ টাকা ইনভেস্ট করে। লাল্টুর দিনের অধিকাংশ সময় ডাক্তারের সাথেই কাটে। মসজিদেই ডাক্তারের সূত্রেই লাল্টুর সঙ্গে রুস্তমের পরিচয় হয়। রুস্তমের সাথেও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। রুস্তম পেশায় ড্রাইভার। তার নিজের একটি ছোটহাতি গাড়ি রয়েছে। দুজন শ্রমিক নিয়ে রাস্তা ও বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করে। লালটু রুস্তমকে জানায় তাদের ছোটহাতি গাড়ি তৈরির কারখানায় তাদের শেয়ার রয়েছে। মোবাইলে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ছোটহাতি গাড়ির ভিডিও দেখায় ও বিভিন্ন নামি দামী ইঞ্জিনের ফটো রুস্তমকে দেখায়। রুস্তমের কাছ থেকে ষাট হাজার টাকা ইনভেস্ট হিসেবে তোলে। শুধু বিশ্বস্তসূত্রে মুখের কথায় কোনো কাগজ ছাড়ায় লাল্টু সমাজ থেকে প্রায় সতেরো থেকে আঠারো লাখ টাকা তোলে।

করোনা প্যান্ডেমিকে কাজ করতে না পেরে রুস্তমের আর্থিক সংকট দেখা যায়। রুস্তমসহ আরো অনেকে লাল্টুর কাছে টাকা চায়। লালটু আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি বলে পালিয়ে বেড়ায়।

রুস্তমের স্ত্রী, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে পরিবার। তাদের থাকার জায়গা বলতে একটি ভাড়া ঘর অ্যাটাচ বাথরুম ও কিচেন। রুস্তম ও বড় ছেলে মেঝেতে ঘুমায়। রুস্তমের স্ত্রী ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে লোহার খাটে ঘুমায়। মেয়েটি মেজ। ক্লাস ফোরে পড়ে। বড় ছেলেটি এইবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল। সারাদিন মোবাইলে গেম খেলে। ছোট ছেলেটির বয়স চার বছর। মেয়েটি মাসে দেড়শ টাকা দিয়ে পাশের বিল্ডিংয়ে এক মহিলার কাছে কোরান শিখতে যায়। কোরান শিক্ষিকা বাংলা মানে ছাড়াই কোরান পড়ায়। ছোট ছেলেটি ছাড়া সকলে সময়সূচি মেনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। রুস্তমের বউ নামাজ পড়ার জন্য ছেলে ও স্বামী রুস্তমকে বেশ পরিষ্কার পোশাক পরিয়েই মসজিদে পাঠায়।

ছোট হাতি গাড়ির ভাড়া খাটিয়েই রুস্তমের পরিবার চলত। করোনায় এবং করোনার পরে তেমন কাজের অর্ডার পায় না। রুস্তম ভেবেছিল ধার নিয়ে গাড়িটি মেরামত করবে। তিল তিল করে জমানো সমস্ত টাকা করোনাতে বসে বসে খেয়ে শেষ হয়ে গেছে।

রুস্তমের বউ বেশ শান্ত স্বভাবের। তেমন খিচ খিচ করে না। বেশ বুদ্ধিমতী। পরিস্থিতি ভালোই বোঝে। শহুরে মানুষদের অল্প অল্প করে বিভিন্ন ভ্যারাইটি খাবার খাওয়া অভ্যেস। করোনার আগে রুস্তমের পরিবারেও এই অভ্যেস ছিল। কিন্তু এখন একটা সবজি আর অল্প খাবার খেয়েই দিন কাটে। বাচ্চা ছেলেটি মাঝে মাঝে উৎপাত করলেও সকলেই পরিবেশকে মানিয়ে নিয়েছে। মাঝে ছেলেটির হঠাৎ শুরু হলো জ্বর। বিনা ওষুধেই শুধু মাথায় পানিপট্টি দিয়ে আর রৌদ্রে শুইয়ে-বসিয়েই দু দিন কেটে যায়। জ্বর ছাড়ে না। ছোট ছেলেটি জ্বরে আর না খেতে পেরে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। হাঁটতে পারে না। আস্তে আস্তে শুকনো স্বরে অল্প কথা বলে। বসে থাকতে পারে না। শুধু মোটা চাদর বা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকে। রুস্তমের স্ত্রীও কাওকে তেমন কথা বলে না। খাওয়া-দাওয়া করে না। রান্নাঘরেও তেমন যায় না। বাচ্চা মেয়েটি কেবল রান্নাঘরে যায়। সকলের জন্য একবেলা আলু সিদ্ধ ভাত রান্না করে। মোবাইল গেম প্রিয় বড় ছেলেটি চিলেকোঠার দরজা খুলে চৌকাঠে হেলানা দিয়ে সারাদিন বসে থাকে। মোবাইল ঘাটে না। মেঝেতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বালিশে মাথা দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে কিবোর্ডওয়ালা মোবাইলে মাঝে মাঝে পিক পিক করে কী টিপে আর শুয়ে থাকে।

হঠাৎ করেই রুস্তম দুদিন ধরে বেপাত্তা। উপরতলার একজন ভাড়াটের ঘরে বাচ্চা ছেলে ও মেয়েটি যায়। জামা টাঙানো ক্লিপ, কলম-খাতা, চিরুনি-আয়না ও রান্না করার কিছু আসবাবপত্র নিয়ে মেঝেতে খেলা করে। তাতে ভাড়াটের ভালো লাগে, বিরক্ত হয়না। বাচ্চাদের বিস্কুট, চা, মাঝে মাঝে কিছু ফলও খেতে দেয়।

কয়েকদিন থেকে বাচ্চারা আসছেনা দেখে ভাড়াটে রুস্তমের দরজায় গিয়ে ও দাদা, দাদা, ও বৌদি, বৌদি বলে ডাকে। বৌদি দরজা খুলে দেয়। ভাড়াটে বৌদির শুকনো মুখ, চোখের নিচে কালচে পড়া দেখে ভয় পায়। বৌদি কোন কথা না বলে, দরজার পাল্লাটা সঙ্গে নিয়ে নিজেও সরে যায়। ভেতরে আসতে বলছে বুঝতে পেরে ভাড়াটে ভেতরে ঢুকে। ছোট মেয়েটি একটি লাল রংয়ের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে,

কাকু এখানে এসে বসো। দাঁড়াও তোমার জন্য আমি চা করছি।

মেয়েটি রান্নাঘরে যাচ্ছে দেখে ভাড়াটে তার হাতটি ধরে বিছানায় অসুস্থ বাচ্চা ছেলেটির পাশে গিয়ে বসে। মাথার পানিপট্টি সরিয়ে কপালে হাত দেয়, গলায় হাত দিয়ে দেখে কতটা জ্বর রয়েছে। বাচ্চা ছেলেটি একবার চোখ খুলে আবার চোখটি বুজে নেয়। বাচ্চা মেয়েটি ভাড়াটের গা ঘেঁষে বসে। ভাড়াটে বৌদিকে জিজ্ঞাসা করে, কবে থেকে জ্বর? বৌদি কোন উত্তর দেয় না। অন্যদিকে মুখ করে অসুস্থ ছেলের পায়ের কাছে বসে থাকে। বাচ্চা মেয়েটি ভাড়াটের গায়ে হেলান দিয়ে বলে, তিনদিন থেকে কাকু। তিনদিন থেকে জ্বর। জ্বর ছাড়ছেই না।

ভাড়াটে কিছু বলে না। অসুস্থ ছেলের হাতটি ধরে শুধু নাড়াচাড়া করে। মেঝের বিছানা গুছানো দেখে জিজ্ঞাসা করে, দাদা কোথায়? দাদাকে দেখছি না!

শুকনো গলায় বৌদি বলে আজ দুদিন থেকে বাড়ি আসেনি। ভাড়াটে বাচ্চা মেয়েটির মাথায় হাত দিতেই মেয়েটি তার বুকে মাথা দিয়ে শান্তভাবে থাকে। ভাড়াটে আবার জিজ্ঞাসা করে, দাদা কোথায় গিয়েছে?

পাথরের মত কোনরকম বিচলিত না হয়ে শান্ত শুকনো গলায় ওপর দিকে চেয়ে বৌদি বলে, জানিনা! কয়েকবার ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেনি। আজকে তো আবার সুইচ অফ করে রেখেছে।

তাদের দেখে, তাদের গলার স্বর ও কথা শুনে ভাড়াটিয়ার আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে না। তারা খেয়েছি কি খাইনি সে প্রশ্নও করতে পারছে না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার জিজ্ঞাসা করে, ওষুধ নিয়ে আসা হয়েছে?

বৌদি কোন উত্তর দেয় না। ওপর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাচ্চা মেয়েটি বুক থেকে মাথা সরিয়ে ভাড়াটের দিকে ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে শুকনো স্বরে বলে, না কাকু। ওষুধ নিয়ে আসা হয়নি। আমাদের টাকা নেই!

ভাড়াটে মেয়েটির মাথা বুকে চেপে ধরে। মেয়েটি বুকে মাথা গুঁজে শান্তভাবে থাকে। ভাড়াটে বলে, বৌদি আমি আপনাকে দুহাজার টাকা দিচ্ছি। আজকেই বাচ্চাটিকে ডাক্তারখানা নিয়ে যান। তার চিকিৎসা করান। প্রয়োজন হলে আরো দেব। যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

তাতেও বৌদি কোন কথা বলছে না। ভাবে স্পষ্ট সে টাকা নিতে চাইছে না। তার আত্মসম্মানে বাঁধছে। ভাড়াটে বুঝতে পেরে বলে, আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি। আপনার সুবিধামতো আপনি শোধ করবেন। তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

বৌদির ভাবে কোন পরিবর্তন নেই। নিরুপায় ভাড়াটে আবার অসুস্থ বাচ্চার মাথায় গলায় হাত দিয়ে দেখে। বাচ্চা মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, তোমার ভাইয়ের যত্ন নিও। কিছু হলে আমাকে জানিও। আর তোমার দাদা এলে বলিও যে কাকু ডেকেছে। ভাড়াটে মেয়েটির হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে থাকা সব বিস্কুট ফল দেয়।

রুস্তমের শালি জমানো কিছু টাকা দিদির কাছে রেখে যায়। আরো কিছু টাকা জমিয়ে গয়না কিনবে বলে। সেই টাকায় এতদিন হাত দেয়নি। কারণ এই কাজহীন অবস্থায় টাকাগুলো খরচ হয়ে গেলে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। রুস্তমের বউ ভাড়াটের কথায় ভয় পায়। বোনের সেই জমানোর টাকা থেকে কিছু টাকা নিয়ে ছেলের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তারের ওষুধে ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে। এই কয়েকদিন পর বাচ্চাগুলো নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু রুস্তমের বউয়ের চোখে ঘুম নেই।

দুদিন পর সন্ধ্যাবেলায় রুস্তম বাড়ি ফিরে আসে। দরজায় নক করে। রুস্তমের বউ দরজা খুলে দেয়। রুস্তমকে দেখে কোন প্রকার বিচলিত বা উত্তেজিত হয়না। একটি কথাও বলেনা। খুবই ধীর গতিতে গিয়ে ছেলের কপালে হাত দিয়ে মাথার কাছে বসে।

শুকনো মুখ। নোংরাময় সারা শরীর এবং জামা প্যান্ট। উশকোখুশকো চুল। বাইকের পেছনে বসে থাকলে যেমন মাথায় ধুলোবালির আস্তরণ পড়ে সেরকমই আস্তরণ পড়েছে চুলে। নিশ্চয় কোন গাছের নিচে বা ফুটপাথে শুয়েছিল। ক্ষুধায় আর অনিদ্রায় চোখ ছোট হয়ে গেছে। রুস্তম সরাসরি বাথরুমে চলে যায়। স্নান সেরে বেরিয়ে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে অসুস্থ ছেলের দিকে চোয়াল এঁটে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর মেঝের গুছানো বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। বাচ্চা মেয়েটিও গিয়ে বাবার পাশে শুয়ে পড়ে। রুস্তম মেয়েটিকে বুকের কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? মা তোমাকে বারবার কল করছিল। তুমি কল ধরোনি কেন?

রুস্তম কোন উত্তর দেয়না। শুধু পাশ ফিরে শোয়।

মেয়েটি উঠে গিয়ে বলে, বাবা তোমার খুব খিদে পেয়েছে। দাঁড়াও আমি তোমাকে খাবার দিচ্ছি। মেয়েটি দ্রুত একটি জলের বোতল, এক থালা দুপুরের ঠান্ডা ভাত আর অল্প একটু আলু ভর্তা বিছানাতেই এনে দেয়।

বাবা উঠছে না দেখে মেয়ে বলে, বাবা ভাত এনেছি। খেয়ে নাও।

রুস্তমের বউ ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। স্ল্যাবে হাত দিয়ে পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একদৃষ্টে চিমনির ফুটো দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুস্তম উঠে হাত না ধুয়েই আস্তে আস্তে খেতে শুরু

করে। মেয়ের কানের কাছে মুখ এগিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, মা খেয়েছে? বাবু খেয়েছে?

মেয়েটিও খুব আস্তে আস্তে বলে, দুপুরে সবাই অল্প করে ভাত খেয়েছি।

রুস্তম ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। তারপর উঠে ঘুমন্ত অসুস্থ বাচ্চার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নেয়। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বাইরের বেরোনোর জন্য দরজা খোলে আর বলে, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

সোজা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা রুস্তমের বউয়ের পায়ে বিশ্রামের ভাজ পড়ে। মুখ না ফিরেই মাথা নিচু করে ডান হাত দিয়ে ওভেনটিকে অন অফ করতে থাকে।

কয়েকদিন পর রুস্তমের বউ রাতে রান্না করছে। রাতে সকলে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে। রুস্তম হঠাৎ আস্তে আস্তে বলে, আমার এক বন্ধুর সহযোগিতায় একটি কাজ পেয়েছি। মালগাড়ির মাল আনলোড করার। সকাল সাত টাতেই কাজে যোগ দিতে হবে।

মুটেরা সাধারণত স্বাস্থ্যবান হয়। সংসারের চাপে ও আর্থিক অনটনের কারণে রুস্তম মোটা হাড়ের মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্যবান নয়। দেহের মোটা মোটা শিরাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। কান থেকে কাঁধের উপর পর্যন্ত মনে হয় বটগাছের কাণ্ড। পুরো কাণ্ড জুড়ে যেমন ঝুঁড়ি আর মূল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে থাকে তেমন। চোয়াল ও চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গেছে। দূর থেকে দেখে তার চোখের ও চোয়ালের হাড়গুলি দেখা যায়। মুটের কাজ রুস্তমের কাছে খুব কষ্টকর। কিন্তু বাড়ির কষ্টের কাছে খুবই নগণ্য। আলিপুর স্টেশনে রুস্তম মাল আনলোড করার মুটের কাজ শুরু করে। প্রতি বস্তা আনলোড করতেই তার মজুরি। সকাল সাতটা থেকে মালগাড়ি থেকে সিমেন্টের বস্তা আনলোড করছে। দুপুর বারোটায় সময় হালকা জলখাবার ও কিছু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মালগাড়িরই ছায়ায় রুস্তমের দলের সকলে বসে। কেও বসে রেললাইনের ওপর। কেও রেলের কংক্রিটের পাটাতনে। দুপুর বেলায় প্রায় মাথার ওপর সূর্য থাকায় ট্রেনের ছায়া বেশি দূর ছড়ায়নি। ট্রেনের ছায়ায় কোনো রকমে সকলের মাথা থেকে কোমর ধরছে আর পা জোড়া দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রেই রয়েছে।

বস্তা থেকে সিমেন্ট ঝরে ঝরে রুস্তমের চোখ দুটি বাদে চোখের পাতার লোমসহ সারা শরীর সাদা হয়ে গেছে। কী রঙের গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে আছে, তা বোঝা বড় কঠিন। রুস্তম মাথার আধ তালু লম্বা চুলে আঙুল ঢুকিয়ে সিমেন্ট ঝাড়ে। ঘামে ভেজা সিমেন্ট লেগে থাকা লুঙ্গিতে হাত দুটি মুছে। তারপর সেই হাত দিয়ে মুখটি মুছে। মাথায় মাল বয়ে বয়ে ঘাড়ে, কোমরে খুব ব্যথা। আস্তে আস্তে মাথাটি একবার আগে পিছে করে একবার ডানে বাঁয়ে এবং শেষে চক্রাকারে মাথাটি দুবার ঘোরায়। রেললাইনের ওপর বসার চেষ্টা করে কিন্তু কোমর ভাঁজ হয় না। আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আবার ধীরে ধীরে বসার চেষ্টা করে। কোমর খুব কষ্ট করে কোনো রকমে কিছুটা ভাঁজ করতে পারে। তারপর আর পারে না। হাত দুটি পেছনে করে তালুর ওপর ভর দিয়ে থপ করে বসে পড়ে। হাতে ঠেস দিয়ে পা দুটি সামনে ছড়িয়ে দেয় প্রচণ্ড রৌদ্রে।

কিছুক্ষণ পর একজন যুবক কাঁসার জগে জল নিয়ে এসে বলে, রুস্তম ভাই তুমি আমাদের থেকে আলাদা হয়ে বসে আছ কেন? নাও, জল খাও, দিয়ে চলো আমাদের ওখানে।

ধীরে ধীরে কোমর সম্পূর্ণ ভাঁজ করে দুহাত বাড়িয়ে জলের জগটি নেয়। কিন্তু কোনো কথা বলে না। যুবকটি বলে, রুস্তম ভাই কী হয়েছে তোমার? আমাকে বলো।

রুস্তম ঢকঢক করে মাত্র কয়েক গলা জলপান করে। ডান পাশে জগটি রেখে দেয়। মনে হচ্ছে জল গলার ভেতর দিয়ে যেতে চাইছে না। জল খাওয়ার পরেও শুকনো গলায় আস্তে আস্তে বলে, বাড়িতে খুব সমস্যা! আর কিছু বলে না।

যুবকটি কিছুটা মালগাড়ির ভেতরে ঢুকে ছায়ায় রুস্তমের পেছনে পাথরের ওপর বসে।

রুস্তম জগটি হাতে নিয়ে অন্য হাতে ভর দিয়ে কোমর নেতিয়ে নেতিয়ে যুবকের পাশে মালগাড়ির ছায়ায় বসে। বলে, খুব কষ্ট করে কিছু টাকা জমিয়ে ছিলাম। ৪ বছরে ডবল হয়ে যাবে বলে মনসুর ডাক্তারের কথায় লাল্টুকে ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলাম। ছেলেটিকে তো খুব ভালোই মনে হতো। এই কয়েক দিন থেকে লাল্টুকে বলছি, আমার ডবল টাকা লাগবে না। আমার টাকা ফেরত দেন। কিন্তু কাল দিচ্ছি, পরশু দিচ্ছি বলে দিচ্ছে না। কিন্তু শুনলাম কাল লাল্টু পালিয়ে গেছে। এখন আমি কী করবো বল ভাই! যুবক রেগে গিয়ে বলে, ডাক্তারকে ধরো। এটা খেটে ইনকাম করা টাকা। ডাক্তারের মতো ঘরে বসে আর দুই নম্বরি করে ইনকাম করা টাকা নয়। কোমরের ঘামে ভেজা গামছাটি খুলে যুবকটি মালগাড়ির নীচ থেকে বেরিয়ে বুক টানটান করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গামছাটিকে আবার শক্ত করে কোমরে বেঁধে বলে, আজকেই ডাক্তারের কলার ধরবো চলো। আমি থাকবো তোমার সাথে।

রুস্তমও জগটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ডাক্তারকে বলেছিলাম আমার সমস্যার কথা। আগে ডাক্তার আমার কথা ভালোভাবে শুনতো। জোর স্বরে বলতো, টাকা দেবে না মানে! ওর বাবা টাকা দেবে। একটা ফোন করেই ওর চৌদ্দগুষ্টিকে জেলে ঢুকিয়ে দেবো। আমার তিন লাখ টাকা ওর কাছে আছে। কিন্তু এখন ডাক্তারের কাছে গেলে,

ডাক্তার বিরক্ত হয়। ডাক্তার বলে, কী করবো বলো! আমি বলেছিলাম তোমার টাকা দিয়ে দিতে। কিন্তু ও যে এত বড় চিট আগে জানতাম না। আর আমরা যে তাকে টাকা দিয়েছি আমাদের কাছে তার কোন কাগজও নেই! কিছু করার নেই। আমরা কি ডাক্তারের কলার ধরতে পারবো? ওর হাতেই তো পুলিশ। কোনরকম সমাধান খুঁজে না পেয়েই দুজনে আবার কাজে যোগ দেয়।

পরের দিন মাল বোঝাই ট্রেন আসতে দেরি হবে জেনে দশটা পঁয়ত্রিশের লোকাল ট্রেনে যাচ্ছে। এই ট্রেনে প্যাসেঞ্জার কম থাকে। আরাম করে বসে যাওয়া যায়। সিনিয়র সিটিজেনের দীর্ঘ সিটে একটি নাইলনের ব্যাগ বগলদাবা করে জানালার সাইডে বসে। ব্যাগে একটি টিফিনবক্স আর একটা জলের বোতল ফ্যাকাশে সাদা গামছা দিয়ে ঢাকা। জানালার রডে কপাল দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে আছে। বড় বড় গাছপালা গাড়ি রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে অট্টালিকা ছবি হয়ে চলে যাচ্ছে। পরের স্টেশনে তিনজন প্যাসেঞ্জার গল্প করতে করতে ওঠে। সাদা জামা, কালো প্যান্ট আর কালো লেদারের জুতা পরা একজন অ্যাডভোকেট। উজ্জ্বল ফর্সা রঙের অর্ধ টাক, কপালে আঘাত লেগে লেগে কালো দাগ। হাতে বিস্কুট রঙের লেদারের ব্যাগ। রুস্তমের লম্বা সিটে অ্যাডভোকেট বসে। অ্যাডভোকেট ও রুস্তমের মাঝে দ্বিতীয় জন বসে। আর তৃতীয়জন অ্যাডভোকেটের বিপরীত সিটে বসে। তাদের গল্পে দ্বিতীয়জন বলে, হযরত মুহাম্মদ হলেন অধিষ্ঠিত চেতনার মানুষ। তিনি কাল পাত্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি অবলম্বন করেছেন। তাকে বিশ্লেষণ করতে হলে মানুষকে ওই অধিষ্ঠিত চেতনার কাছাকাছি বা চেতনাগত ভাবে অধিষ্ঠিত হতে হয়।

রুস্তম আলোচনা শুনে সম্বিত ফিরে পায়। ঘুরে বসে। বসার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য হাতের ব্যাগটি সিট থেকে নামিয়ে দুই পায়ের ফাঁকে রাখে। মনোযোগ দিয়ে অ্যাডভোকেটদের আলোচনা শুনতে থাকে।

দ্বিতীয়জনকে বাধা দিয়ে অ্যাডভোকেট বলেন, হযরত মুহাম্মদ বললেই সাল্লাল্লাহু সালাম বলতে হবে।

হযরত মুহাম্মদের নাম বললেই 'সাল্লাল্লাহু সালাম' শব্দ দুটি বারবার ধরিয়ে দিচ্ছে দেখে দ্বিতীয়জন বিরক্ত হয়। জিজ্ঞেস করে, হযরত মুহাম্মদের আসল নাম কী? আর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্থ কী? আপনি কি জানেন? অ্যাডভোকেট বলেন, না।

দ্বিতীয়জন বলেন হযরত মুহাম্মদের আসল নাম হল আহম্মদ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থ আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুক। আমরা নিজেরা সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য আলোচনা করছি। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের নাম পুরোটাই কেন বলতে হবে? এই যেমন কথায় কথায় যদি আপনার নাম সেখ মোশারফ হোসেন দাদা বলি সেটা কি শ্রুতি মধুর হবে? এইভাবে বারবার পুরো নাম বললে কি আমাদের আলোচনা করতে ভালো লাগবে না শুনতে ভালো লাগবে?

বাম হাতের আঙুলের খয়রি রঙের পাথর বসানো মোটা সোনার আংটি ঘোরাতে ঘোরাতে অ্যাডভোকেট বলেন, সেটা ভালো লাগবে না। কিন্তু! না!

নামের যে সেন্টিমেন্ট তার রয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার শক্তি তার নেই বুঝে দ্বিতীয়জন আগের আলোচনায় আবার ফিরে যায়। বলে, হযরত মুহাম্মদের মাধ্যমে পাওয়া গ্রন্থ যা সমগ্র মানবজাতির জন্য তা কীভাবে বিশেষ জাতির গ্রন্থে পরিণত হল?

অ্যাডভোকেট আবার কিছু একটা হাদিস তুলে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাতে তেমন জোর ছিল না।

অ্যাডভোকেট কিছু বলছে দেখে দ্বিতীয়জন থেমে আবার বলতে শুরু করেন, ইসলামের একমাত্র জ্ঞানগ্রন্থ হল কোরান কিন্তু মানুষ কথায় কথায় হাদিস থেকে উদাহরণ দেয়। দুটোই আরবি ভাষায় রচিত। তাহলে কোন লক্ষ্যে কোরানকে আড়াল করে হাদিসকে সামনে নিয়ে আসা হল। কালেমা, সালাত কায়েম, সিয়াম ও জাকাত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিত্ব গঠন করে বিশ্ব অর্থনীতিতে অর্থাৎ হজ্বে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সম্পদ বা অর্থের সুষ্ঠু বণ্টন কীভাবে হবে তার তদারকি করা। আর্থসমাজ ও পরিবেশের বিকাশের ব্যবস্থাপনা করা। কিন্তু বর্তমানে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে না। অর্থাৎ হজ্বে অংশগ্রহণকারীর চরিত্র গঠিত হচ্ছে না। সম্পদ ব্যক্তিতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে সমস্ত রাষ্ট্রেই এই একই রূপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাক্ষিক মানুষ প্রকট ধনবৈষম্য থেকে শুধু নিজেদের আড়াল করার জন্য প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য প্রচার করে ও বিভিন্ন সেন্টিমেন্টের নেশায় বুঁদ করে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ দরিদ্র শ্রেণির মানুষ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়ায় বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। অর্থসংকটে বেশ্যাবৃত্তি বাড়ছে। অর্থ উপার্জন করতে না পেরে বিবাহ করতে ভয় পাচ্ছে। দেহের জৈব চাহিদায় দেহমন বিকৃত হয়ে সমকামী হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র সমাধান না করে বেশ্যাবৃত্তি, সমকামী আরও অনেক যৌনবিকৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়াতেই মেতে রয়েছে। খুন, অপকর্ম বেড়ে চলেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই জিডিপি গ্রোথ বেড়ে চলা সত্ত্বেও এই প্যানডেমিকের মধ্যেও

পরবর্তী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

তিতাস

সুকৃতি

এলাকার নামি স্কুল। ক্লাসরুম। টিচার টেবলু।
—সবাই দেখ, এইটা কী বই?
—সাধারণ জ্ঞান (সবাই চিৎকার করে)। একজন (তিতাস) তাদের সাথেই বলে ওঠে— জেনারেল নলেজ।
—ঠিক, সাধারণ জ্ঞান বা জেনারেল নলেজ। মুখ ভেংচে চোখ গোল করে বলে— ও টিপাস! ভালোই ইংরেজি বলছিস তো? দু একজন দুষ্টু ছেলে মুখ টিপে হাসে। এই তোরা আর কেউ জানিস এই বইটাকে ইংরেজিতে কী বলে?
তিতাস ছাড়া বাকি সবাই সমস্বরে বলে— জেনারেল নলেজ
—মাথা ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট চিপে স্যার বলে— তাহলে তিপাস তো ভালোই জানে। আচ্ছা, তুই আগে কোন স্কুলে পড়তিস রে?
—প্রাইমারিতে।
—টিউশন কার কাছে?-
—স্কুল হয়না বলে মা-ই পড়ায়।
তিতাসের দিকে স্যার ভ্রুক্ষেপ না করেই শুরু করে— তাহলে কাল তোমরা কী শিখেছ, পরিবারে কে থাকে, কে কী হয়? এসব। কি তিপাস?
—হ্যাঁ স্যার। পড়েছি। স্যার আমার নাম তিতাস। স্যার চোখ ঘুরিয়ে মুখ ভার করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে— হু, কিন্তু আমার তিপাস বলতে ভালো লাগে, (সবার উদ্দেশ্যে বলে) আমার তিন বছরের মেয়ে বুলবুলি ওকে তিপাস বলে তো তাই! যাহ, আ-র বলবো না। স্যার মুচকি হাসতেই পুরো ক্লাস আবার হো হো করে ওঠে। দুই নম্বর চ্যাপ্টার পড়ানো শুরু হয়েছে, তিতাসের বইয়ের পেজ বাতাসে উলটে তিন নম্বর চ্যাপ্টার শিক্ষা, শিশু ও শিক্ষক এ এসে থেমেছে। সে মুখ নিচু করে আছে, চোখ ছলছল কিছু দেখতে পাচ্ছে না।
স্যার ক্লাসরুমে পায়চারি করতে করতে সুন্দর করে বলিষ্ঠ উচ্চারণ সমেত প্রতিবেশী কাকে বলে, কারা প্রতিবেশী, ইত্যাদি পাঠ করতে থাকে। সকলে মাথা নাড়ে মাঝে মাঝে। স্যার ভিতরে ভিতরে তৃপ্তি অনুভব করে। ক্লাস শেষে নতুন এই নামকরা স্কুলের নতুন কয়েকজন ক্লাসমেট তিপাস তিপাস বলে খ্যাপাতে থাকে, তিতাসের কান্না পায়, সারা রাস্তা তিতাস মুখ ভার করে বাড়ি ফেরে।
রাতের বেলা ঘুমানোর সময় তিতাসের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে রুবিনা স্কুলের সব ঘটনা জেনে নেয়। তিতাস সহজে কিছু বলতেই চায়না। তার থেকে কিছু জানতে হলেই রুবিনাকে অনেক বেশি চালাক হতে হয়।
টেবলু মাস্টারের বাড়ি তিতাসদের পাশের বাড়িটা, গোলাপি বর্ডারসহ ফ্রেশ সাদা রঙের ঝকঝকে। রুবিনার ঘর বলতে রাস্তা বরাবর দোড়তি দুটো বড় বড় ইটের ঘর, টিনের ছাদ, রান্নাঘর সমেত বাকি অংশটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। টেবলুর দুবছর হল এখানে আসা। এলাকার প্রভাবসম্পন্ন মোড়ল, মেম্বারসহ পার্টির লোকের সাথে ওঠাবসা। রুবিনার সাথে তাদের ভাব জমেওনা, জমাতেও চায়না। রুবিনা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে পাওয়া সেলাই মেশিন দিয়ে পাড়ার লোকজনের ব্লাউজ, নাইটি, জামা প্যান্ট সেলাই করে। যা আয় করে তাতে সংসারে টানাটানি হয়। তিতাসের বাবা মদ খায় আর জুয়া খেলে। ভালোমন্দের বোধ তার নেই। পাড়ার রাজনীতির ছেলেপুলেদের দরকার মত কথা শুনে কাজ করে নিজেকে ধন্য মনে করে। সংসারের অনটনকে আল্লার দান বলে মানে। তিতাসের ভালোমন্দের ভাবনা তাই রুবিনার হাতেই। তবে টেবলুর কাণ্ডকারখানার জবাবটা না দিয়ে সে কিছুতেই ক্ষান্ত হবেনা। বিশ দিন আগেই রুবিনার চারটা মুরগি মারা গেছে। কানাঘুষো শোনা যায় বাড়ির পেছন দিকে শাক আর কিছু সবজি চাষের সময় টেবলুর বউ পাড়ার অন্যদের জানালেও তাকে না জানিয়ে জমিতে বিষ দেয়। চার দিন আগে তার বছর খানেক বয়সের দলদলে ছাগলটার পা ভেঙে দিয়েছে। ওটা কুরবানি দেয়াও যাবেনা। কুরবানির জন্য বিক্রি করাও যাবেনা। তারপরে আজকের ঘটনা রুবিনাকে ভিতরে ভিতরে ক্রমাগত দগ্ধ করছে। স্বামীকে বলে কিছু লাভ নেই।
পরের দিন। জাতীয় সংগীত শেষে রুবিনা স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের সাথে দেখা করে।— আরে রুবিনা যে, এস। তা কী খবর? রুবিনা চেয়ার টেনে বসে বলে— দেখুন আপনি আমার এলাকার। আমার খুব পরিচিত মানুষ। দাদা বলে ডাকতে পারি। তবু সম্মান জানাতে স্যার বলেই সম্বোধন করি। হেডমাস্টারের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটু কেশে, বাম হাত দিয়ে কলারটা ঠিক করতে করতে বলেন— সে বুঝি, তুমি শিক্ষিত বংশের মেয়ে, এরকম হাভাতে ঘরে না এলে, আর মুকুলটা বখে না গেলে, তোমাকে এমন দিন দেখতে হয়? তোমার চাকুরিটাও এদ্দিনে— মুখের কথা শেষ না হতেই রুবিনা বলে,—না স্যার ওসব থাক, চাকুরি আমিও যে করব কি করব না সে ব্যাপারটাও তো আছে।
—ঠিক, ঠিক, তা হলটা কী?

—আমার পাশের বাড়ির টেবলু মাস্টার আমার ছেলেকে বিকৃত নামে ডাকে, অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে। কাল তিতাস কান্না করতে করতে বাড়ি গেছে।
—কেমন অবহেলা? যদি পরিষ্কার করে বলো। ছেলের থেকে জানা সব কথা সে হেডমাস্টারকে জানায়। এর সত্যতা তিনি যাচাই করতে পারেন। রুবিনা চলে যেতেই হেডস্যার দাঁত কিড়মিড় করে, বিড়বিড় করে বলতে থাকে— উহ, লাটসাহেবের বিটি চাকুরি নেবার ইছে নেই! পেলে তো!
হেডমাস্টার ওই ক্লাসের অন্য বাচ্চাদের থেকে জানতে পারে রুবিনা পুরোই ঠিক বলেছে। টেবলু মাস্টারকে হেডমাস্টার বলে, এসব কেউ করে? আগের মত দিন পাওনি, যে ভক্তিতে গদগদ ভাবে কেউ কিচ্ছুটি বলবেনা। আজ কালকার বাচ্চারা যা পাকা আর তাদের প্রেস্টিজ! তাছাড়া বুদ্ধি নিয়ে কাজ করো। শুধু পড়াও বলে টাকা পাচ্ছো এমন ভাবনা ভেবোনা। স্কুল না থাকলে পড়াবে কোথায়? অভিভাবক মিটিং পর্যন্ত এসব ঝামেলা যাতে না পৌঁছায় তাই ভাল। টেবলু ব্যাপারটা থেকে কথার মাঝেই দু একবার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে।
যাইহোক তিতাস কদিন বেশ হাসিখুশি স্কুলে গেলো, এলো। রুবিনা একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিল। মুকুলও নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ তার পরিসরের মধ্যে থাকা মানুষদের কাছে কোনো অভিযোগ তাকে নিয়ে যেতে হয়নি। পুরো ব্যাপার সব রুবিনাই কি সুন্দর সামলাচ্ছে।
দুমাস পরে। রুবিনার মুরগি টেবলুর বেডরুমে ঢুকে পালানোর সময় পাখার ঝাপ্টায় তার সুন্দর অত্ত বড় বাইশ বাই পনেরো ইঞ্চি মাপের মার্ক্সের ছবিটা ভেঙে দেয়। তারই প্রতিহিংসায় টেবলু তার বাড়ি লাগোয়া তিতাসদের বেড়াটা লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে। পরের দিন তিতাস আবার স্কুল থেকে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে।

---

৩৭ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

দাসত্ব

মানুষকে না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মরতে হচ্ছে।
অ্যাডভোকেট ব্যাগের ওপর হাত দুটি রেখে শিরদাঁড়া সোজা করে জোর গলায় বলেন, আমাদের ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। হাদিসে আড়াই শতাংশ জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সবাই আড়াই শতাংশ জাকাত দিলে কোথাও দরিদ্র মানুষ থাকবে না। এর রেফারেন্স আমার কাছে আছে। তুমি কি এটা অস্বীকার করো?
দ্বিতীয়জন শান্ত হয়ে বলেন, হাদিসে আড়াই শতাংশের কথাই বলা হয়েছে। এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু কোরানে বলা হয়েছে যা তোমার উদবৃত্ত তাই জাকাত। এই দুটো কি এক কথা? ধরেন আপনার এবছর একশো টাকা উদবৃত্ত হল। আপনি আড়াই শতাংশ জাকাত দিলেন। আপনার কাছে থাকল সাতানব্বই পঞ্চাশ পয়সা। পরের বছর আপনার আবার একশো টাকা উদবৃত্ত হল। মোট উদবৃত্ত হল একশ সাতানব্বই টাকা। আপনি জাকাত দিলেন একশ সাতানব্বই টাকার আড়াই শতাংশ। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হচ্ছে না কুক্ষিগত হচ্ছে? আপনি বলুন।
অ্যাডভোকেটের দিকে চেয়ে থেমে আবার বলেন, বিশ্ব মানবজাতির জন্য জ্ঞানগ্রন্থে যে থিয়োরি দেওয়া হয়েছে তা ধ্রুবক। যা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। না করে শুধু ঘটা করে পালন করলে তা শুধু অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সেখানে মানবসত্তা তথা মানবতার কর্ষণ হয়না। মানুষ কোনো শক্তিও পায়না। আর্থসমাজের অন্ধকারও দূর হয়না।
টালিগঞ্জ স্টেশনে তিনজনে নেমে যায়। রুস্তম তাদের গল্প শুনতে শুনতে তার স্টেশন পেরিয়ে পরের স্টেশন চলে এসেছে, বুঝতে পারে নি। তাদের সাথে সাথে রুস্তমও নেমে যায়।
পরের ট্রেনে গিয়ে কাজে যোগ দেয়। কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলায় রুস্তম বাড়ি ফেরে। প্রতিদিনের মত রুস্তমের বউ খাবার, পোশাক রেডি করে রাখে। রুস্তমকে বলে, যাও স্নান করে এসো। রুস্তম স্নান করে খালি গায়ে খেয়ে বাচ্চা ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খেলা করে। নামাজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রুস্তমের বউ রুস্তমের পায়ের দিকে বিছানার একপাশে বসে বলে, কি গো তুমি মসজিদে যাবে না?
রুস্তম বউ এর কথায় গুরুত্ব দেয় না। বউয়ের জন্য বিছানায় একটু জায়গা করে দেয়। রুস্তমের বউ মাথার নিচে হাত দিয়ে রুস্তমের পাশেই শুয়ে পড়ে। রুস্তম বাচ্চাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে।

হিত অহিত

রনিক পারভেজ

—দাদা তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হয় নি। এসো একদিন বাড়ি, কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।
—ভাবছি এবার যাব, অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয় নি। এক বছর থেকে বাড়ি যায় নি। মা বার বার বাড়ি ডাকছে। কি করবো বল। এই দিকে সংগঠনের কাজে নানান জায়গায় যেতে হচ্ছে।
—সেতো ঠিকই বাড়ি ঘর সংসার ছেড়ে মেহনতি মানুষের কথা ভাবছো। নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায় তোমার। 'মা' উপন্যাসের চরিত্র তো তোমার মা নয় - বলেই বারবার বাড়ি ডাকছে। যেখানে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় নেই মা কে নিয়ে ভেবে কি হবে। বিপ্লব তো এখন হাটে-বাজারে হওয়ার কথা।
—এইভাবে বলিস না। সব কিছুকে ব্যঙ্গ করা ঠিক নয়।
—তাহলে কী ভাবে বলব বল। যেখানে নিজ চরিত্রই পরিবারের কাছে ক্লিয়ার নয়, আর্থসমাজ মনে এর কী প্রতিফলন হবে। তোমাদের বিপ্লব কী নিজ পরিবার বাদ দিয়ে সব অন্য পরিবারের জন্য।
—অনেকদিন পর বাড়ি এসেছো। যাবে কবে...?
—যাব, দুই একদিনের মধ্যে যাব। অনেক কাজ আছে। একটি এন জি ও টাইপ স্কুল করার পরিকল্পনা করছি....তারজন্য ফান্ড সংগ্রহ করতে হচ্ছে।
—এখনই চলে যাবে, অনেক কাজ আছে বলছিল কাকা। চাষ, নিড়ানি, ফসলে জল দেওয়া এগুলি দেখাশোনার জন্য একটা লোকের প্রয়োজন ।
—কেন? যেভাবে হচ্ছে সেভাবেই হবে।
—দাদা কীভাবে দেখাশোনা হচ্ছে সেটা কি তোমার জানা আছে? আমার মনে হয় নিশ্চয়ই জানা নেই। তোমার জানা আছে মেহনতি মানুষের কথা কিন্তু কাকার কথা নয়, সেও যে একজন গতরে খাটা মানুষ।
—তার মানে বলছিস আমি বাড়ির দিকের কথা ভাবি না। বাবা মার খোজ খবর রাখি না।
—ভাব, নিশ্চয়। উপায় বের করতে পারো না।
—কাকা কাকিমা এখন পাশের বাড়ির লোকের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পার্টি ক্লাসে এই সব নিয়ে কোনো কথা হয় না।
—তোরা নিজেকে কী ভাবিস, সব কাজ একসাথে করে উঠা সম্ভব নয়। তোদের মত বাড়িতে বসে থেকে বৃহত্তর সমাজের কাজ করা যায় না। কাজ করতে হলে শ্রমজীবী মানুষের হয়ে কাজ করতে হয়।
—একদম নয়, প্রথমে নিজের চেতনায় আলো ফেলে দেখ কোথাও অন্ধকার দেখতে পাও কিনা।
—সব কিছু এভাবে হয় না। তার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় চাই। কাজের জন্য নিজেকে সপে দিতে হয় পার্টি নেতৃত্ব এর নির্দেশিকার উপর।
—তারমানে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে পার্টিজান মেন্টালিটি নিয়ে কাজ করলে বিপ্লব হয়ে যাবে! আমার কি মনে হয় জানো - গন্তব্য কোথায় না জেনে গন্তব্যে পৌঁছতে চাইলে সে দূর অস্ত থেকে যায়। আগাপাশতলা কিছুই পাওয়া যায় না। আর তোমাদের এঁড়ে যুক্তি থাকে। কোনো কিছুই মেনে নিতে পারো না।
আজ থাক বাড়ির দিকে যাই। পারলে বাড়িতে থেকে কাজ কর তাতে কায়িকশ্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নাহলে চাঁদার টাকায় খেয়ে ব্যাঙ হয়ে যাবে।

কুয়াশা সরিয়ে

বৈশালী রায় চৌধুরী

আমি বলাকা, আমার পরিচয় আমি সম্পূর্ণ সহায় সম্বলহীন, মাতৃহীন, পিতৃহীন তরুণী, আমার থাকার মধ্যে কলকাতার টালা এলাকায় বস্তির এক কামরার একটি ঘর, আর সৎমা শিখা। শিখাকে অবশ্য সৎমা না বলে আমার একমাত্র বান্ধবী বলায় শ্রেয়। আর আছে শিখার একটি চার বছরের কন্যা সন্তান। না, শিখার কন্যা সন্তান আমার সৎ বোন নয়। শিখার প্রথম স্বামী ছিলেন আমার বাবা, কন্যা সন্তানটি শিখার দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান। শিখার কন্যা সন্তানটি আমার থেকেও দুর্ভাগা। আমার তবুও পিতৃ পরিচয় দেবার অবকাশ আছে, ওর তাও নেই। ও শুধু শিখার সন্তান বলেই আমরা মনে করি। আমার আর শিখার তত্ত্বাবধানেই বেড়ে উঠেছে, আমার বোন। আসলে আমাদের তিনজনের সম্পর্কটা বড় অদ্ভুত। শিখা আমার মা অথচ মা নয়, শিখার মেয়ে আমার বোন অথচ বোন নয়। অবশ্য আমার নিজস্ব উপলব্ধি, রক্তের সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্কের থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অনেক বেশি দামি। তাই আমরা তিন বান্ধবী থাকি, একেবারে জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রহের মত।

শিখা এখন ঘরে বসে ঘরোয়া রান্না করে। আমি কলেজ, টিউশন, কোচিং ক্লাস সামলে অফিস পাড়ায় খাবারের টিফিন ক্যারিয়ার দিতে যাই। দুপুর একটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত আমার এই কাজ চলে। ফিরে টিউশনে কোচিং ক্লাস। সন্ধ্যায় শিখার মেয়েকে নিয়ে বসি। ও হাঁ, ওর নাম রেখেছি সোমদত্তা অর্থাৎ শিবের দান। আমাদের সংসারে শিবের দান হয়েই থাকুক ও। ডাকনাম দত্তা রেখেছি। সন্ধ্যাবেলায় ওর আধো আধো টরটরে বুলিতে আমার সাথে বলতে শেখায়— আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সূয্যি গেল পাটে অথবা টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার।

আমারও ভাগ্যের চাকা ঘুরল একদিন। দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী করোনা অর্থাৎ কোভিড-১৯ নামে ভাইরাসটি পৃথিবীকে ছারখার করে দেবার পরের বছরই। পৃথিবী এখন অনেক শান্ত, পুরোনো ছন্দে ফিরছে। রাস্তাঘাট স্বাভাবিক লোক চলাচল করছে। পোলিও, হাম, বসন্তের মত টীকাকরণের ফলে মানুষ অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এমন পরিস্থিতিতেই এল আমার চাকুরির নিয়োগপত্র। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, কাউন্সেলিং এ শিক্ষকতার শহর হিসাবে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরকে বেছে নিই। এমনিতেই আমি অনেক দূরে চলে যেতে চাই। আসলে যার নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা থাকেনা, তার পরিসর অনেক বড় হয়ে যায়, মননে স্বপ্নেও সে বিশ্বাস করতে শুরু করে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় তার ঠিকানা হতে পারে। একদিন এই ঠিকানাহীনতার জন্যই আমি আদিম মাতৃক্রোড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ভে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কাজেই আমাকে বাঁধতে পারে এমন কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই। টিকে থাকাটাই আমার ঠিকানা, যখন যেখানেই হোক না কেন।

আজ আবার সেই শীতকালের ভোর.... ঘন চাপ চাপ কুয়াশার আস্তরণ চারিদিকে। মনটা ভালো নেই কাল থেকেই। গতকাল আমার বিবাহ বার্ষিকী ছিল। প্রথম বছর বিবাহ বার্ষিকী। হাসছেন... আপনারা, দোজবরে বিয়ে, বরের প্রথম পক্ষের একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে, তিন বছরের ছেলে বর্তমান। তাই আবার বিবাহ বার্ষিকী। না, না, হাসবেন না, আমার ইচ্ছেতেই এই বিবাহ। কোন চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে নয়। শৈশবে মাতৃহীন আমি কৈশোরে পিতৃহীন। বাবা, মা হারানোর যন্ত্রণা আমার মতো করে কেই বা বুঝেছে। সে যাই হোক, বিবাহ বার্ষিকীর আগের দিন আমার দোজবরে শিক্ষক স্বামী আমাকে হলুদ রঙের কাশ্মীরি শাল উপহার দিয়ে বললেন, '১৯শে জানুয়ারি পরো। আমি জানি, হলুদ তোমার বড় পছন্দের রঙ।' আমার পছন্দ... হায় রে, কবে কেইবা আমার পছন্দের কথা ভেবেছে। টালা বস্তির মেয়ে আমি। ঈশ্বর সহায়, তাই এতদিন বেঁচে আছি। নইলে কোন এক কুয়াশার ভোরেই আমার ছিন্নভিন্ন শরীর পাওয়া যেত রেললাইনে। —জীবনের প্রথম ভালোবাসার উপহার। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে চোখে জল এসে যায় আমার। আমাদের ঘরের কাঁচের পাল্লাটানা তাকটায় তুলে রাখি শালটা। কাল সন্ধ্যাবেলা শালটা পরতে গিয়ে দেখি... সেটা নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই। আমার স্বামী ভারী ভালো মানুষ, শান্ত প্রকৃতির। প্রথম স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। সেই শোক সেই ধাক্কা এই তিন বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বললেন, ঠিক আছে, মানুষই হারিয়ে যায়- এ তো সামান্য শাল। ঠিকই তো, সজীব প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী, সেও যখন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন এ-তো সামান্য জড় বস্তু। আজ ভোরবেলা ঘন কুয়াশার মধ্যে ছাদে হাঁটতে আসি। হঠাৎ ছাদের কোণটায় পায়ের কাছে নরম নরম কি যেন ঠেকে। তুলে দেখি সেই হলুদ শাল। কাঁচি দিয়ে ফালাফালা করে কাটা। যেন কোণ প্রতিপক্ষ শত্রু দেশের সেনা প্রবল আক্রোশে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তার প্রতিপক্ষকে। শালটা তুলে পাঁচ মিনিট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি জানি এটা কার কাজ। তবু সহ্য

করতে হবে, মানবিক হতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে, যে ভয়ঙ্কর খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে উদ্যত। তৈরি করতে হবে আরেক সহমর্মী বলাকাকে- পৃথিবীর কাছে ঋণগ্রস্ত আমি।

এখানে আমি কি করে এলাম তার বিবরণ শোনাই আপনাদের। বহরমপুরে এক ছোট্ট হাই স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করি। আমার সঙ্গে শিখা আর শিখার মেয়ে দত্তা কেও নিয়ে আসি। আসলে আমি ছাড়া শিখা আর দত্তার কেউ নেই। আবার আমারও শিখা, দত্তা ছাড়া এ জগতে কেউ-ই নেই। তাছাড়া দত্তারও একটা নির্মল পরিবেশ দরকার যেখানে কোনভাবেই কেউই জানবে না দত্তার বাবার কথা। সবাই জানবে দত্তার বাবা মৃত। আমার বিমাতা অবশ্য কৃতজ্ঞতা ভারে পিষ্ট হচ্ছিলেন- বললেন বলু, সারাটা জীবন পড়ে আছে তোর, সারাটা জীবন কি আমাদের নিয়েই চলবি? আমি বললাম- এভাবে ভেবো না, আমরা পরস্পরকে আশ্রয় করেই বাঁচি, কী বল। সহকর্মী দিদিদের কারুর সাথেই ঘনিষ্ঠতা বাড়াই না আমি। কী দরকার জটিলতা বাড়িয়ে। ক্ষুদ্র খোলসে নিজেকে আবৃত করে রাখার কৌশল আমি ছোটোতেই আয়ত্ত্ব করেছি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ইনভিজিলেটর এর দায়িত্ব পাই বিদিশাদির স্কুলে। এরপর আমার জীবন অন্য খাতে বইতে থাকে। প্রথম দিন ডিউটি করি আমি আর বিদিশাদি। আমার থেকে অনেকটা বড় বিদিশাদি। প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে যায় তাঁকে। অনেকটা স্নেহনশীল গোছের। কাজের ভাগাভাগি নেই, নেই সূক্ষ্ম চুলচেরা হিসাব। বন্ধুত্বের হাতটা আগেই বাড়াতে জানেন। একসঙ্গে ফিরি ফেরার পথে। আস্তে আস্তে শুরু হয় অসমবয়সী বন্ধুত্বের। দিন যায়, আস্তে আস্তে বিদিশাদির প্রাতভ্রমণের সঙ্গী হয়ে পড়ি। বিদিশাদি ভরপুর সংসারী। দুই পুত্র কন্যা স্বামী নিয়ে সদাব্যস্ত। তার মধ্যেও আমাদের সখ্যতা বাড়তে থাকে। একদিন বিদিশাদি মর্নিং ওয়াকের পর বলে তুই বাড়ি চলে যা, আমি একজনের বাড়ি যাব। তাড়া না থাকলে তুইও আসতে পারিস, সঙ্গী হলাম বিদিশাদির। গঙ্গার পাড় দিয়ে বেশ কিছুটা দক্ষিণে যাবার পর ঢাল বেয়ে একটা বড় দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। তারপর গেট খুলে দোতলায়। তিন্নি তিন্নি করে ডাকতেই একটা বছর আট নয়েকের মেয়ে দৌড়ে এল। মাসীমনি করে জড়িয়ে ধরল। বিদিশাদি তিন্নিকে ধরেই, ভাই কেমন আছে এখন? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতরে ঢুকলেন। অবিন্যস্ত ডাইনিং হল, যত্রতত্র ছড়ানো জামাকাপড়, খেলনা স্তূপ, সোফার পাশে ডাঁই করে রাখা পুরানো খবর কাগজের স্তূপ। বিদিশাদি বেসিনে হাত ধুয়ে বাথরুমে পা ধুয়ে ডাইনিং এর সোজাসুজি যে বেডরুম তাতে ঢুকলেন। বারো তেরো মাসের একটি বাচ্চা ছেলেকে কোলে তুলে বেরিয়ে এসে বললেন এখনও তো গায়ে জ্বরটা আছে- এভাবে চলে রাহুল? যার নাম সেই ভদ্রলোকটি সোফার এককোণে বাইরের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমাদের দুজনকে দেখেও তার কোনো ভাবান্তর ঘটেনি। বিদিশাদিকে বললেন, কে আপনার সঙ্গে দিদি? দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন সে সব কথা পরে হবে, থার্মোমিটারটা দাও। তোমার পিসি কোথায়?

এর মধ্যে তিন্নি ডেকে এনেছে তার পিসিঠাকুমাকে। দিদি আমাকে বসতে বললেন, তারপর ছোট্ট বাচ্চাটিকে আর তার পিসিঠাকুমাকে নিয়ে কাছাকাছি কোন এক ডক্টরের চেম্বার থেকে বাচ্চাটিকে দেখিয়ে আনলেন। ইতিমধ্যে আমি অনেক কথা জেনে ফেলেছি। রাহুলের প্রয়াত স্ত্রী শর্মিলা বিদিশাদির বোনের মত। ছোট্ট বাচ্চাটার জন্ম দিতে গিয়ে ডাক্তারের গাফিলতিতে মারা গেছেন। তারপর থেকে ভদ্রলোকের হতশ্রী দশা। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়েও দেখেননা। মুদিখানার বাজার করে দোকানেই ফেলে আসেন। স্কুল যান অন্যমনস্কভাবে। ফেরেন অন্যমনস্কভাবে। বাকি সময় চুপচাপ সোফায় এক কোণে। দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন এক সহায় সম্বলহীন পিসিকে। সে যতটা পারে দেখে রাখে বাচ্চাগুলোকে।

ফিরতে বেলা দশটা বেজে যায়। বিদিশাদি বলেন- শর্মিলাদের সাথে আলাপ বেশিদিনের নয়। বছর পাঁচেক আগে সিমলা, কুলু মানালি বেড়াতে গিয়েছিলাম একই ট্রাভেল এজেন্টের সাথে। তারপর থেকে নৈকট্য। শর্মিলা মারা যাবার দিন পাঁচেক পর স্বপ্ন দেখি- শর্মিলা খুব অসহায়ভাবে বলছে, আমার বাচ্চাদের দেখে রেখো বিদিশাদি, ওদের বাবার আর চলার ক্ষমতা নেই গো। তারপর থেকেই যতটা পারি- এভাবে হয় বলতো? বাচ্চাদুটোর মুখ ভীষণ ভাবে মুখের সামনে ভাসে।

আমার নিজের ছোটোবেলাটা আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলে। কোনো পরিস্থিতিতেই তাকে ভুলতে পারিনা। মাঝে মাঝেই বিদিশাদির সঙ্গে চলে যাই বাচ্চাদুটোর সাথে সময় কাটাতে। এরপর বিদিশাদির মধ্যস্থতায় রাহুলের সাথে আমার বিয়ে হয় খুব সাধারণভাবে, পাঁচজন নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে। আমি শর্ত রাখি শিখা আর দত্তাকে বাড়ির নিচতলায় একটু জায়গা দেবার জন্য। আমার শর্ত মঞ্জুর হয়। অবশ্য ওরা ওদের মতই আছে। কিছু আর্থিক সাহায্য আর সাহচর্য দিই সাধ্যমতন।

ডাইনিং এর কাঁচের আলমারিটায় একটা বড় সাদা কাপ আছে। জানেন পাঠকেরা, ওই কাপে শর্মিলাদি আর তিন্নির ছবি প্রিন্ট করা। আমার কেমন যেন মনে হয় শর্মিলাদি হাসছে। আমার উপস্থিতিতে উনি অসুখী হননি, অন্তত আমার ধারণা। আসলে দেহধারণ করা আত্মার থেকে

দেহহীন আত্মারা আমাকে বেশি বোঝে বলেই আমার ধারণা। ছোট্টু পুরোপুরি আমারই সন্তান বলেই মনে করি। আমি যখন স্কুলে যাই, বাইরের ব্যালকনির থেকে— মা, টাটা বলে ছোট্টু।

তিন্নি আমার গর্ভজাত এ কথাই আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এমনকি স্বপ্নেও। ওদের বাবা অনেক নিশ্চিন্ত, সবে ফিরেছে। মাঝে মাঝেই বিদিশাদিকে বলি— দিদি যে ভার আমাকে দিয়েছ তার মর্যাদা রাখবই আমি। তিন্নিকে সকালেই পড়াই আমি, তারপর স্কুলকারে তুলে দিই। ও পড়ে বিদিশাদির স্কুলে। তারপর আমি স্কুলে যাই। তিন্নি সাইকেল চালায়, আমি ছোট্টুকে নিয়ে হাঁটি। সন্ধ্যা বেলায় ছোট্টু, দত্তাকে নিয়ে ছড়া শেখাই, ছবি আঁকাই। খালি তিন্নির চোখদুটো পড়তে পারিনি আমি। ওর চোখের ভাষা আমার অজানা। ও বায়না করেনা, রাগেনা, দৌড়ায়না, খিলখিল করে হেসে ওঠে না। কখনো বলে না এই টিফিন দিও না, আমার ভাল লাগেনা।

আমি ছাদ থেকে ধীরে ধীরে নামি। ছোট্টু আমার আর ওর বাবার মাঝখানে ঘুমোয়। দেখি দুইজনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পায়ে পায়ে নামি তিন্নির ঘরে। তিন্নি আর পিসি ঘুমোয়। পিসি অনেকক্ষণ উঠে গেছে, ঘরদোর সামলানোর জন্য। তিন্নির চুলে হাত দিই। ও জেগে আছে, ঘরে পা দিয়েই বুঝেছি। বলি, "আয় তিন্নি খাটের নিচে পুরোনো বাক্সগুলোতে এই ছেঁড়া শালটা লুকিয়ে ফেলি আমরা। তোর বাবা দেখলে তোকে বকবে। আমার হলুদ রং ভীষণ অপছন্দের... এমনিতেও পরতাম না।'' তিন্নির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "এ শালটার এমন দশা কে করলো গো?'' বললাম আমিই করেছি। আর কাল থেকে ভাই বাবা ও ঘরে ঘুমোক। তুই আমি এঘরে, রাজি? তিন্নির চোখে ঘোর অবিশ্বাস, আমি কথা দিই তুই আমি একটা গ্রুপ, বাবা ভাই আলাদা গ্রুপ। "আর পিসি ঠাম্মা কোথায় ঘুমোবে?'' তোর স্টাডিতে ছোট্ট ডিভানে। ঝলমল করে ওঠে তিন্নির মুখটা। আমি বলি, "তিন্নি আমি একবছরে মা হারিয়েছি, দশ বছরে বাবা, তোকে আর কিছু হারাতে দেব না, আমি।'' জানলাটা পুরোটা খুলে দিই আমি, বাইরে চাপ চাপ কুয়াশা সরে গেছে, সূর্যের হালকা নরম রোদে শর্মিলাদির মিষ্টি মুখটা দেখতে পেলাম, হাসছে। আবার ওই মুখটাই পরিবর্তন হয়ে গেল আমার পার্শে রাখা মায়ের ফটোর হাসিহাসি মুখটাতে। দুটো ছবি আলাদা করতে পারছিলাম না, দুটোই এক সঙ্গে মিশে গেছে। শর্মিলাদির মুখটাতেই স্পষ্ট মায়ের আদল।

স্বেচ্ছাসেবক

সুদীপ সরকার

মিত্তির বাবু একটা বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি করেন। একই সংস্থায় আছেন, তাও প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল। এখন অবসরের দোরগোড়ায়। কর্মজীবনের মাত্র দুবছর অবশিষ্ট আছে। নিজের কাজটা সবসময় মন দিয়েই করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কখনই ম্যানেজারের মন পান না। ম্যানেজার সুবিমল চৌধুরী খুবই খুঁতখুঁতে প্রকৃতির মানুষ। মিত্তির বাবু বিগত দশ বছর ধরে সুবিমল চৌধুরীকে প্রসন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। কাজে দক্ষতা দেখানোর পাশাপাশি অল্পবিস্তর তৈলমর্দনের চেষ্টাতেও কসুর রাখেননি। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হতাশাগ্রস্ত হৃদয়ে স্বগতোক্তির ঢঙে বলেছেন, ব্যাটা তেলও খায় না। মিত্তিরবাবুর বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টটা, এই ম্যানেজার সাহেবের কলমের খোঁচার ওপরই নির্ভর করে। তাই তাকে তোয়াজ করার এতো চেষ্টা। এছাড়াও কাজের ন্যূনতম প্রশংসা যেকোনো অধস্তনই দাবি করে। এরমধ্যে কোনো অন্যায়ও নেই কিন্তু আবেগবিহীন ম্যানেজার শত চেষ্টাতেও অবিচলিতই থাকেন। সুবিমল চৌধুরী যে মিত্তিরবাবুকে খুব অপছন্দ করেন, এমনটাও নয় কিন্তু ম্যানেজারের বিশেষ পছন্দের গোষ্ঠীতে মিত্তিরবাবু কখনও ঢুকতে পারেনি। কাজেই গড়পড়তা হয়েই রয়ে গেছেন। আসলে ম্যানেজমেন্টের কেউকেটারা বোধহয় এমনই হন, কখনও তারা কাউকে বিশেষ প্রশস্তিতে ভরায় না। প্রশংসায় তারা বড়ই কৃপণ। মিত্তিরবাবুও এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

মিত্তিরবাবুর একমাত্র পুত্র সন্তান, নাম তার রজত। স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকুরির চেষ্টা করছে। এখন আবার তার মাথায় সমাজ সেবার ভুত চেপেছে। করোনাজনিত ভয়ে সবাই যখন ঘরে সেঁধিয়ে গেছে, সে তখন পিপিই কিট গায়ে চাপিয়ে প্রতিদিনই সমাজসেবা করতে বেরোচ্ছে। স্থানীয় একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভলান্টিয়ার হয়েছে। এই অতিমারি জনিত পরিস্থিতিতে দিন-রাত এক করে রোগীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। টিউশন করে উপার্জিত অর্থের প্রায় সবটাই এই খাতে ব্যয় করছে। এমনিতে রজত খুবই সচেতন, বাড়ি ফিরে বাইরের কলের জলে ভালোভাবে স্নান না করে সে কখনও ঘরে ঢোকে না। তবুও ছেলের এইসব কাজে মিত্তিরবাবুর একদমই সায় নেই। মিত্তিরবাবুর খালি মনে হয়, গিন্নির প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়েই ছেলেটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এখন কোথায় ভবিষ্যত গড়বে, তা না করে অযথা সময় নষ্ট করছে। মিত্তিরবাবুর ভাষায় তার ছেলের এসব কাজ হল, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। এসকল কারণে, ঘোরতর সংসারী মিত্তিরবাবুর সাথে বাউন্ডুলে রজতের সম্পর্ক বেশ শীতল। রজতের মা-ই পিতা-পুত্রের মধ্যে কিছুটা সেতু বন্ধনের কাজ করে। মিত্তিরবাবুর সাথে অফিস ইউনিয়ন সেক্রেটারির সম্পর্ক বেশ ভালো। সেই সুবাদে ছেলেকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দেওয়ার কিঞ্চিৎ চেষ্টা শুরু করেছিলেন। আত্মসম্মান রজত পিতার এহেন প্রচেষ্টাতেও জল ঢেলে দিয়েছে যা পিতা পুত্রের সম্পর্কের অবনতির ক্ষেত্র আরোও খানিকটা প্রশস্ত করেছে। মায়ের মারফত রজত তার শুভাকাঙ্ক্ষী পিতাকে বার্তা দিয়ে রেখেছে, সে তার চাকুরি নিজেই খুঁজে নেবে।

এদিকে রজতের স্বেচ্ছাশ্রম তথা স্বেচ্ছাসেবক জনিত কাজের পরিধি বাড়তেই লাগলো। নিজের উপার্জনের অর্থে কেনা বাইকটাকে সম্বল করে প্রতিদিনই সে সমাজসেবা করতে বেরিয়ে পড়ে। টিম লিডার যেখানে পাঠায় বিনা বাক্য ব্যয়ে সেখানেই সে ছুটে যায়। কাজের প্রতি তার অনুরাগ দেখে কে বলবে সে একজন আনপেইড ভলান্টিয়ার। এ কাজের জন্য তার পকেটে কোনো অর্থ ঢোকে না বরং পকেট থেকে নিজের উপার্জিত অর্থ বেরিয়ে যায়। শুধু কি তাই, তাদের কাজের বহর দেখে, সমাজের নিন্দুকেরা ভ্রু কোঁচকায়। বাঁকা দৃষ্টিতে সমালোচনার ঝড় তোলে। তাদের ভাবখানা এমন, নিশ্চয়ই এসব কাজে এদের কোনো স্বার্থ আছে। অবশ্য যাদের নিয়ে এতো আলোচনা তারা নিতান্তই ভাবলেশহীন। সত্যিই রজতকে দেখে বোঝা যায়, এই ভলান্টিয়াররা যেন অন্য গ্রহের মানুষ। রজত একাজে তার মায়ের প্রছন্ন মদত অবশ্যই পায় কিন্তু যতই হোক মায়ের মন তো, অতশত ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে আসা ছেলের স্বাস্থ্যের চিন্তায় মায়ের মন সদাই উৎকন্ঠিত থাকে। দামাল ছেলে আবার মা কে বরাভয় দিয়ে বলে, তুমি ভুলে যেও না, তুমি একজন ভলান্টিয়ারের মা। একজন সৈনিকের মায়ের মতই তুমি আমার জন্য গর্ব অনুভব করতে পারো। অতো চিন্তা তোমাকে মানায় না। মা-ছেলের খুনসুটি চলতেই থাকে। মা অন্তরে ছেলের জন্য গর্ব অনুভব করে ঠিকই কিন্তু মনের উচাটন ভাবটা রয়েই যায়। যাইহোক, কোনো একদিন সন্ধ্যা ছটা নাগাদ রজতের কাছে ফোন এল। ষাটোর্ধ এক রোগীর অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল নেমে যাচ্ছে। এখনই তাকে সিলিন্ডার নিয়ে সেখানে ছুটতে হবে। সৈনিক যথারীতি যুদ্ধাস্ত্র গায়ে চাপিয়ে রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এখন তার একটাই লক্ষ্য যুদ্ধ জয় অর্থাৎ রোগীকে উপযুক্ত পরিষেবা দিয়ে সাহায্য করা। মৃত্যুর

করাল গ্রাস থেকে কোনো একজনকে রক্ষা করা। অনেক সময় নিকট আত্মীয়রাও যার কাছে যেতে ভয় পায়, তার প্রতি সহমর্মী হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সে তো একজন সমাজকর্মী, নিজের সংসারের বাকি খুঁটিনাটি চিন্তাভাবনার দায়িত্ব তো তার নয়। সেটাতো মা বুঝে নেবে। রাত দশটা বাজল। রজত তখনও বাড়ি ফিরল না। মায়ের ফোনের প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দিল, আজ কোনোভাবেই সে বাড়ি ফিরতে পারবে না, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরেই রয়েছে। এক প্রৌঢ়কে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। জনৈক বৃদ্ধ আর ওনার মিসেস একা থাকেন। ওনাদের মেয়ে -জামাই কোলকাতা থেকে আসছে। এই অবস্থায় ওনাদের ছেড়ে রজত কিছুতেই রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না। মিত্তির গিন্নি প্রমাদ গুনলেন। মিত্তিরমশাই যাইহোক, এতোদিন সব মেনে নিচ্ছিলেন কিন্তু রাতে ছেলে বাড়ি ফিরবে না, এটা উনি কিছুতেই মানবেন না। যথারীতি সমস্ত ঘটনা মিত্তিরমশাইয়ের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি খেপে আগুন হলেন। পরের দিন ছেলেকে উপযুক্ত সবক শেখাবেন বলে গিন্নিকে হুমকি দিয়ে রাখলেন।

পরদিন সকাল আটটায় যুদ্ধ জয় করে বিধ্বস্ত সৈনিক ঘরে ফিরল। মায়ের মুখে হাসি ফুটল। সারা রাত জাগা ক্লান্ত অবসন্ন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিচ্ছন্ন হয়ে রান্নাঘরে আসতে। ছেলের জন্য খাবার বন্দোবস্ত করতে মা কাজে লেগে পড়ল। রাগে গনগন করতে করতে পিতা এসে দাঁড়াল পুত্রের সন্মুখে। মিত্তির গিন্নি চোখের ইশারায় কত্তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। রাত জেগে সমাজসেবা করাকে যে উনি কখনই সমর্থন করবেন না তা ছেলেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে দিলেন, সমাজসেবা অথবা বাড়ি এই দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা তাকে বেছে নিতে হবে। ছেলের জেদও তো নেহাত কম নয়। আর্ত মানুষের সেবা করার মধ্যেই যে জীবনের পরম আনন্দ নিহিত আছে, সেকথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা রজত গৃহত্যাগে উদ্যত হল। অশ্রুসিক্তা মিত্তির গিন্নির মধ্যেকার দুই পৃথক সত্তার কাতর আবেদনেও পিতা-পুত্রের দ্বন্দের অবসান হল না। সামাজিক পরিস্থিতি যতদিন না স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন সে ক্লাব ঘরেই থাকবে, এই কথা বলে রজত ঘর ছাড়ল।

মিত্তির মশাইয়ের মোবাইল ফোনটা বেজে চলেছে। ফোনটা রিসিভ করার আগেই কলটা কেটে গেল। অফিসের ম্যানেজার সাহেব ফোন করেছিল। এখন তো লকডাউন চলছে তাই অফিস যেতে হচ্ছে না। ম্যানেজার সাহেব ফোন করেছে মানে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ দরকার আছে। এক্ষুনি হয়ত অফিস ছুটতে হবে। মিত্তিরমশাই রিংব্যাক করতে যাচ্ছেন এমন সময় তাকে অবাক করে ম্যানেজার সাহেব দ্বিতীয়বার কলব্যাক করলো, যেটা সচরাচর ঘটে না।

—হ্যাঁ স্যার বলুন।

—কেমন আছেন মিত্তিরবাবু?

—ভালো আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন স্যার? মিত্তিরমশাইয়ের বিস্ময়ের পারদ বাড়ছে। এহেন সৌজন্যমূলক কথাবার্তা ওনার সাথে একদমই চলে না।

—ভালো আছি।

—স্যার, আমাকে কি অফিস যেতে হবে?

—আরে না না, এখন লকডাউন চলছে, অফিসে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন তেমনই করুন।

—আচ্ছা স্যার

—আজ আমি আপনাকে একান্তই ব্যক্তিগত কারণে ফোন করেছি।

—মিত্তিরমশাই নিজের অন্তরের উত্তেজনাকে যতোটা সম্ভব প্রশমিত করে বললেন, হ্যাঁ স্যার বলুন।

—মিত্তিরবাবু আপনি আমাকে ঋণী করে দিলেন। আপনার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

—কি বলছেন স্যার!! মিত্তিরমশাইয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। উত্তেজনার পারদ বেড়েই চলেছে।

—আপনার ছেলে যে এতো গুণী তা তো আগে জানতাম না।

—বিস্ময়ের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে মিত্তিরমশাই বললেন, স্যার..

—আপনার ছেলে কাল যেভাবে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার শ্বশুরমশাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গতকাল সারা রাত আমাদের পাশে ও যেন দেবদূতের মত ছিল। পরে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, রজত আপনার ছেলে। আপনি একজন ভাগ্যবান পিতা মিত্তিরবাবু। আপনার মিসেসকে আমার প্রণাম জানাবেন, উনি একজন রত্নগর্ভা।

—স্যার

—অফিস খুললে আপনি আমার চেম্বারে দেখা করবেন। ঠিক আছে, এখন রাখলাম।

অনির্বচনীয় এক আবেগে মিত্তিরমশাইয়ের তখন হাত-পা কাঁপছে। ফোনটা রেখে ঘাড় ঘোরাতেই দেখলেন, অশ্রুসজল নয়নে সহধর্মিনী তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের স্ত্রী এর কাছেও মিত্তিরমশাই লজ্জায় অধোবদন হলেন। স্বেচ্ছাসেবক পুত্রের সৌজন্যে নিজের জীবনের চরম অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দেও তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। অব্যক্ত এই যন্ত্রণার ব্যথা বড়ই নিদারুণ। একজন ভলান্টিয়ারের পিতা হওয়াও যে এতোটা গর্বের তা তিনি আজ বাস্তবিকই উপলব্ধি করলেন।

বেঁচে থাকার স্বপ্ন

তুষার ভট্টাচার্য

নারুর চায়ের দোকানের ভাঙা বেঞ্চে বসে গদাই রাগে একদলা থুতু ফেলে চিৎকার করে বলল— শালা গোটা দুনিয়াটাই হারামি। বুঝলি -এবারও হলনা। লিস্টে নাম নেই। শালা এম এ পাশ করে, টেট পাশ করে বসে আছি। তাও, প্রাইমারিতে চাকুরি হল না। কত রদ্দি মাল ঘুষ দিয়ে চাকুরি পেয়ে গেল। যা-ও কটা প্রাইভেট টিউশন করাতাম, তা-ও করোনার জন্য বন্ধ। বল এভাবে বাঁচা যায়? মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

দুপুরের দিকে নারুর চায়ের দোকানটায় ভিড় কম থাকে। যত ভিড় সকালবেলায় বাজার টাইমে।

নারুর ছোটবেলার প্রাণের বন্ধু গদাই। খুব মেধাবী ছিল লেখাপড়ায়। কোনও চাকুরি বাকরি না পেয়ে এখন ক্ষ্যাপার মতন হয়ে গেছে।

যাইরে, একটা দড়ি কিনে আনি। বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই বুঝলি। বিড় বিড় করে এইসব বলে ভাঙা সাইকেলে চেপে চলে গেল গদাই। হঠাৎই গদাইয়ের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দড়ি দিয়ে কী করবে গদাই? ছেলেটা রাগের মাথায় যদি কিছু করে বসে এই ভাবনা গেঁথে গেল নারুর মনে। গদাইয়ের জন্য দুর্ভাবনায় সন্ধ্যা হতেই দোকান বন্ধ করে দিল।

কিছুটা গিয়েই গদাইদের পুরোনো ভাঙা বাড়ি। অন্ধকারে ঢাকা। ওর মা বাবা কবেই মারা গিয়েছে। দুই দাদা কলকাতায় থাকে। ভাইয়ের কোনও খোঁজও রাখে না। নারু হাতের টর্চটা জ্বেলে জোরে জোরে ডাকল— গদাই, গদাই আছিস?

কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাঙা দরজায় ধাক্কা মারল পা দিয়ে। দরজার খিল খুলে গেল সহসা। কী করছিস তুই?

নারু টর্চের আলো জ্বেলে দেখতে পেল - ফ্যানের সিলিং এ একটা মোটা পাটের দড়ি ঝুলছে। তার নীচে একটা টুলে বসে আছে গদাই। ঘেমে নেয়ে একশা।

এই দৃশ্য দেখে নারু চিৎকার করে বলল- না তোকে এভাবে মরতে দেব না। চল আমার সঙ্গে চল। এই চোর চোট্টা ঘুষখোরের দেশে চাকুরি হয়নি তো কী হয়েছে? কত লোকেরই তো চাকুরি নেই। তার জন্য সবাই কী মরে যাচ্ছে?

চল- ওঠ ; কাল থেকে আমার দোকানে থাকবি । তোকে দোকানের পাশেই একটা চাউমিন রোলের দোকান করে দেব ।

এই সব বলে নারু গদাইকে জোর করে বাইরে নিয়ে এল। গদাই কাঁদতে কাঁদতে বলল -রবিবার কলকাতা থেকে দাদারা আসছে, বাড়িটা প্রোমোটারদের কাছে বিক্রি করে দেবে। আমি যাব কোথায় নারু?

এই সব চিন্তা বাদ দে। আমার সঙ্গে থাকবি। আরে আমারও তো কেউ নেই।

পূর্ণিমার রুপোলি চাঁদের আলোয় ভরে গেছে সমস্ত চরাচর। শুনসান রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হরিহর আত্মা দুইবন্ধু। বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে।

কবিতা

মানিক জ্যোতি দাসের দুটি কবিতা

কবন্ধ এ সময়

আচ্ছা, আপনি কি শব্দটা শুনতে পেলেন, এক্ষুনি যে ভয়ংকর শব্দটা হলো?
আপনি কি শুনতে পান আপনার ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, পাশের গলিতে, রাজপথের দু'ধার জুড়ে প্রতিদিন যে স্বপ্নগুলো ভেঙে পড়ছে যা ওই আমেরিকার গগনচুম্বী বিল্ডিং দুটোর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং বেশি, আরো অনেক বেশি।
এইতো এক্ষুনি আপনার পাশের বাড়িতে হুড়মুড় শব্দে একটা স্বপ্ন ভেঙে পড়লো আর তরুণ যুবকটির লাশ কাঁধে বেরিয়ে এল তার বৃদ্ধ পিতা?
ওইতো পিছন বাড়ির মেয়েটি ফিজিক্সে এম.এস.সি-র পর কাউন্সিল কোয়ালিফাই করেও এত বছর ভাঙা স্বপ্নের দেয়াল চাপা জীবন থেকে শেষমেশ কোনো মতে নিজেকে বার করে নতুন স্বপ্নের কাজল চোখে পরতে না পরতেই সব খুইয়ে এইতো একটু আগেই ঝুলে পড়লো দড়িতে। ওই যে দেখুন, চিনতে পারছেন? ওই পি.এইচ.ডি করা ছেলেটিকে । যার বাবা পই পই করে বলেছিল 'ভালো করে লেখাপড়া করো। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে শিক্ষা ডিগ্রী এসব খুব জরুরি। আমরা বনেদি ঘরের মানুষ। তোমার দাদা ইঞ্জিনিয়ার, দিদি ডাক্তার। তুমি অন্ততঃ কোনো একটা কলেজ কিম্বা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হও। 'ওই দেখুন, সে এখন চোখে ঠাসা হাজারো স্বপ্নের ভেঙে পড়া টুকরো-টাকরাগুলোকে জীবনের মেঝে থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ঝাড়ুদারের ফর্ম হাতে দাঁড়িয়ে আছে এইট পাশের লাইনে। এসব আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না? কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না? ব্যাপারটা কি বলুন তো?
ওহো, আমিতো ঠিকভাবে খেয়ালই করিনি আপনাকে। এইতো সেদিন আপনিই তো বুদ্ধিজীবীর মিছিলে কি একটা মূর্তি ভাঙা নিয়ে প্রতিবাদে গলার শিরা ফুলিয়ে ষাঁড়ের মতো চিল্লাচ্ছিলেন। আর তাতে ক্রুদ্ধ-উদ্বুদ্ধ আপনাদের ছেলেরা পাঁচটা বাড়ি ভেঙে এল তৎক্ষণাৎ আবার তার পাল্টা আক্রমণ ঠেকাতে পুলিশ ভাঙলো কতকগুলো নিরীহ মানুষের হাত-পা-মাথা সেদিনও আপনার কাঁধের শান্তিনিকেতনি ঝোলা থেকে এইভাবেই উঁকি মারছিলো শতাধিক কাজের ফিরিস্তি কার্ড আর আপনার নেতৃত্ব ব্যক্তিত্বের মুখোচ্ছবি।
কথায় কথায় এতো ভাঙাভাঙি করেন, হৈ-চৈ তোলেন অথচ এই স্বপ্ন ভাঙার শব্দটা শুনতে পেলেন না?
আপনি কি অন্ধ? আপনি কি বধির?
ওহ্ মাই গড! আমিতো খেয়ালই করিনি আপনার চোখে সাঁটা 'উন্নয়ন'-এর কন্ট্যাক্টলেন্স আর কানে গোঁজা 'স্তুতিগান'-এর ইয়ারফোন। ধুত্তোর!

শিকার

মানিক জ্যোতি দাস

জাল ছিন্ন করছি আর যুগপৎ
জড়িয়ে পড়ছি জালে।
চক্রব্যূহের রথীদের মতো জালের
প্রতিটি গ্রন্থি আমার চেনা।
অঙ্গুলির ডগায় আমার মুক্তি নাচে
অথচ মোক্ষম টানটা দিতেই
বারবার ভুল হয়ে যায়।
পরাধীন যন্ত্রণা অজগরের মতো
আমার পৃথিবীকে গ্রাস করে
অথচ মোক্ষম আঘাতটা দিতে
ভুল করে ফেলি। হায়নার মুখে
নিজেই তুলে দিই আমার হাত পা মাথা।
অথচ হায়নার কলজে ছিঁড়ে নেবার
কৌশল আমার জানা।

গুচ্ছ কবিতা

রঞ্জন পাড়ুই

বুলডোজার

পলিটির সর্বাঙ্গ থেকে নৃশংসা ঝরে সশব্দে,
এক এক করে ধ্বসে যায় খসে যায় পসরা-গৃহ-দেবালয়
সবই!
নগর-চেতনার উপর দিয়ে চলে যায় বুলডোজার,
আঁচড়াই চাঙড় তোলে পিষে দেয় সরু-স্মিত লাল-নীল-
সাদা-সবুজ কতই না স্বপ্ন-বুনোট!

কার পাঠানো বুলডোজার?
জানো সে কে?
কে কে কারা তাকে আত্মীয় মানো?
অন্তরমহলটা দেখ শীঘ্র করে!
স্মরণ করো, বিংশের জার্মান জাত্যভিমানী!
চেতনায় বুলডোজার চালানো কতই সহজ!
কার জন্য?
বিভাজন-বিষে চোখ-কান-মুখ আর তাবৎ অনুভূতি বেচেছো
তার কাছে?
কে সে, কোন নয়া হিটলার?

তবে জেনো, বুলডোজার বাইরে নয়, আগেই চলেছে অন্তরে
অন্তরে বহুকাল
তোমার চেতনার যত নরম-সুন্দর, সাধের বসত-বাটি
করেছে ভেঙে চুর!
তবেই না সে বাইরে বেরয় এমন
নিঃশঙ্ক, করে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত সদর্প তাণ্ডব!

মাটির বুকের উপর দিয়ে, তোমার বুকের উপর দিয়ে
হৃদয় দলিত-মথিত বুলডোজার-অনাচার
পার হয়ে যায়!
ঘৃণা নেই, রিরংসা বা বিবিমিষা বা ক্রোধ অভিব্যক্তি?
সমস্ত চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করে তার
ভারত-আত্মা চরমতম ঘৃণা-বৃষ্টি শুরু করলেই
বিংশের হিটলার যেমন ছিন্ন-মস্তা,
শেষ-অংকে তার রেখেছিল হিসেব, ইতিহাস;
একই প্লট, এ-তো সেই বেইমানি!
পরেতেই সেই আবার ছিন্নমস্তা-কাহিনির রিপিট প্রহসন!

শিকলের স্বাধীনতা

অতিন্দ্রীয় ধারণায় তোমার বিভাজন-বিষ পার্লামেন্ট
আনাচ কানাচ জনপরিসর
মিডিয়া
ইউনিভার্সিটি কলেজ হয়ে
স্কুলের চৌহদ্দি গিলে নেয় কখন ;

ইতিহাসের তথ্যলোপাট ছক্কাপাঞ্জায়
ও মেয়ে! তোমার গলায়-বুকে মাথায়-মুখে তুলেছে হিজাবি
শিকল পর্দা কত কী!
তার সাথে পাল্লা দিতে এভূমিতে এঁড়েরা মাতে ধারণার
স্যাফ্রন বিষ-ছড়াতে!
স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি পেরনো ও যুব! ও মেয়ে!
প্রতিষ্ঠা খোঁজ কোথায়
ধর্ম-শিকলের রঙবেরঙ কারসাজিতে?
না, শ্রম ক্ষেত্রটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভিতে?
এ কি শিখিয়ে দিতে হয়
জীবন শিখিয়ে দেয়!

আচানক বাগান থেকে ডালপালা তছনছ করে ফুল ছিঁড়েছ,
মলিন বিষাক্ত বিশুষ্ক সে ফুলেরা লড়াই করে ধর্ম-নেশায়
তুমি ধরিয়েছ নেশা, মনে রেখ!

জবলেস সেই সব বিষাক্ত ফুল
তোমার ইন্দ্রপুরীর দরজা চিনে নেবে একদিন
সেই দিন অভিশাপমুক্ত শুদ্ধ চিত্ত
খুঁজে নেবে তোরণদ্বার, মনে রেখ!

ততদিন তোমার 'হিজাব-স্যাফ্রন' বিষ ঢাল
ঢালতে থাক;
শিব 'নীলকণ্ঠ' জানি ভুলেই যাবে তুমি
মনে রেখ!

ঘাতক কে?

উর্দি কি ঘাতক?
উত্তর খোঁজে উর্দি, জনতা চাতক!
রেজোয়ানুরের ঘাতকও খুঁজেছিল সে
জ্ঞান-বন্ত!
আজও সে পেয়েছে জবর দায়িত্ব!
ঘাতক ও শাসক কখন যে হয়ে যায় সমার্থক

একটিই হিসেব তার, বাকি সব নিরর্থক
যোগ-সূত্র সর্বদা উর্দি, কীসের চরিতার্থক?

তোমাকেই দিতে হবে উত্তর
ইন্দ্রপুরীর ঘাস-কানন বা পদ্মপুকুর
মানুষ-খেকো কল কেন, জনতার আদালত
চলবেনা, চলবেনা থাকলে নিরুত্তর!

যুগ যুগ জিও

তোমার কারণে বসেছিনু পথে
হত্যে দিয়ে, 'ন্যায়'-লক্ষ্য ছিল সাথে!
৫০০ দিন গিলে খেয়েছি, অতি অবহেলে
অবশেষে অনেক আঁধার পেরিয়ে, সেই তো তুমি এলে!

জীবন হল ধন্য, প্রাণ হল তৃপ্ত, আজ বক্ষ পরিপূর্ণ;
৭৫০ প্লাস ৮৫০ নং গেম এ সে যে ভীষণই দঢ়
তাই নব আনন্দে জেগেছি আজ, নই তো আর মূঢ়!

যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও স্লোগান কাঁপায় শিসে ;
ভুলে গেছি ম্যারাপ বেঁধে লড়াই ছিল কীসে!
শত্রু কে, মিত্রই বা কে রে?
জানার কী দরকার, লাভ বা কী রে?

নতুন ম্যারাপ বাঁধে, পুরোনো খুলে যায়;
ফি-বার শত্রু বন্ধু হয়, জয়ধ্বনি উছলায়!
প্রতিটি লড়াই পরিণতি পায় রানি পদপ্রান্ত
আঁধার চিকন কি হয়, পথিক দিকভ্রান্ত!

মেরু প্রান্তের দণ্ড বা দণ্ডের মেরু নিয়ে প্রশ্ন কি উঠে?
উঠা কি দরকার, নাকি নয়— মুষ্ঠিবদ্ধ হাত বটে!
জ্ঞান-ঋষি পথ সব যুগেই দেখায়,
না দেখলে এমনই হয়!

আঁধার আরো গাঢ় হলে তখন হয়তো বা
'অশনি'র চকিত চমক বজ্রাহত করে রানীর লোলজিহ্বা!

খণ্ড অখণ্ড

চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিভাজন দেখতে পাও কারা,
বিষ চোখে তাকিয়ে দেখ সূর্য কী তারা!
তুমি যখন দূর প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে দেখ
অথবা দিগন্ত রেখায় চোখ রাখ
যখন আকাশ অসীমে ধেয়ে যাও
কিংবা অ্যামাজন গহিনে অবগাহ
ভাগ ভাগ কি কিছু দেখ?
নাকি অখণ্ড অসীমে বিস্মিত শিশু তুমি তখন!

মাথার ভিতরের তন্তুগুলি কাজে লাগলে ঠিকই জানা যায়,
কে এসব ভাগ করলে!
লাভ কী বা ক্ষতি কত কার?
নগদ হিসেবেই জবাব মেলে তার!

আদি ঊষার সেই সে প্রত্যুষে বিস্ময়-শিশুর সহজন্মেই কীট-
বৃশ্চিক যার
পিছন পিছন ধায়!
কীট চেন... কীট ধর... বন্দি কর তারে
এই তো শিক্ষা, দীক্ষা যার পরে
ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে ব্যক্তি
পরিপাটি সাধের জীবনী শক্তি!
কীট বন্দি যখন!

জতুগৃহ

আসমুদ্র কাদের জুটিয়েছ
বাজার দোকান পাড়ার মোড় গলি ও ঘরবাড়ির দুয়ারে
দুয়ারে
সাঙাতদের দেখিয়ে বলেছিলে
'ভাগ করে খাস, একা খাস নে'

সমুদ্র থেকে পাহাড় তারা খাচ্ছে বেশ
ভাগ করে কিনা জানা নেই
দখল পালটা দখল রক্ত বমনের রেশ
আকাশ-বাতাস কটু গন্ধে ভরে দেয়...

তুমি মানুষ'-'মানুষ' আর 'উন্নয়ন'-'উন্নয়ন'
গল্প করে করে 'অধিকার' কথাটিকে আরও হঠিয়েছ...
অনেক কাল আগেই লালছোপ উদবোধন করেছিল সব্বাই
বেনিফিসিয়ারি!
এখন বেনিফিট একটু বেশি আহা মরি মরি!

অধিকার নেই
অধিকার বোধও নেই
বলে কর্তব্য বোধও নেই
লোভ আর আতঙ্ক কেবল খেলা করে
লুম্পেন কর্তার প্রাসাদের অনতিদূরে
ঝলসে যায় মাটির দেহ
মাংস পোড়া গন্ধে ভরে যাচ্ছে দেশ!

Issue date 18 June 2022.
Vol. 4, Issue 2 Voice Mark

সোসিও প্ল্যান কালচার অরগানাইজেশন (এসপিসিও)

ডিহিপাড়া ♦ লালগোলা ♦ মুর্শিদাবাদ ♦ পিন-৭৪২১৪৮

সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় আর্থসমাজ অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি পড়ুন ও পড়তে উৎসাহিত করুন—

'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী 'অস্তিত্ব'	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী 'অস্তিত্ব'	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

Published by Md. Azad Hossain from Bhagwanpur, Ashariadaha, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.